লিনসকোটেনের দেখা ভারত

সংকলন

প্রেমময় দাশগুপ্ত

ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড

* কলিকাতা *

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৬০

মুদ্রাকর :
কিঙ্কর কুমার নায়ক
নায়ক প্রিন্টার্স
৮১/১-ই রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৬

আমাদের কথা

"তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত" প্রকাশের পর "বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ". পর্যায়মালার সপ্তম গ্রন্থ "লিনসকোটেনের দেখা ভারত" বের হলো। আগের গ্রন্থগুলি পাঠক সমাজে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। এই গ্রন্থটিও অনুরূপ সাড়া জাগাতে পারবে আশা রাখি। এই গ্রন্থটিতে অনেক বেশী তথ্য জানতে পারবেন ইতিহাস-জিজ্ঞাসুরা। সাধারণ পাঠকরাও যাতে রসগ্রহণে বঞ্চিত না হন সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রকাশক

গ্রন্থমালার অন্যান্য বই

মারকো পোলোর দেখা ভারত

অলবেরুনীর দেখা ভারত

ইৎসিঙের দেখা ভারত

ইবন বাতুতার দেখা ভারত

মানুচির দেখা ভারত

তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত

ফা-হিয়েনের দেখা ভারত

সূচীপত্র

ভুল সংশোধন

৯ম পৃষ্ঠা ২০-২১ লাইনে "এলো তাদের দেখাদেখি ওলন্দাজ আর ফরাসীরাও।" এর পরিবর্তে হবে "এলো তাদের দেখাদেখি ফরাসীরাও।" ডাচ ও ওলন্দাজ দুটি শব্দেই হল্যাণ্ডবাসীদের বোঝায়।

৮৫ পৃষ্ঠায় শেষ লাইনে 'অল পারকো'-র বদলে হবে 'অল পরকা'।

লিনসকোটেনের দেখা ভারত
কি:মি: ০ ২০০ ৪০০ ৬০০ ৮০০ কি:মি:
পাকিস্তান
চীন
সাংপো নং
নেপাল
ভুটান
ব্রহ্মপুত্র নদ
গঙ্গা নং
বাংলাদেশ
কর্কট ক্রান্তি
চট্টগ্রাম
ব্রহ্মদেশ
সিন্ধু নদ
শতদ্রু নং
ইরাবতী নং
চম্বল নং
বেতোয়া নং
শোন নং
নর্মদা নং
তাপ্তি নং
মহানদী নং
গোদাবরী নং
কৃষ্ণা নং
মুসলিপত্তম
দিউ
দমন
ব্যাসাইন
বোম্বাই
সলসেট্টি
চউল
গোয়া
ওনোর
বরসেলোর
মাঙ্গালোর
কান্নানোর
কালিকট
কোচিন
কুইলন
নেগাপত্তম
মাদ্রাজ
কুমারিকা অন্তরীপ
কলম্বো
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর
৭২°
৮০°
৮৮°
৯৬°
৩২°
২৪°
১৬°
৮°
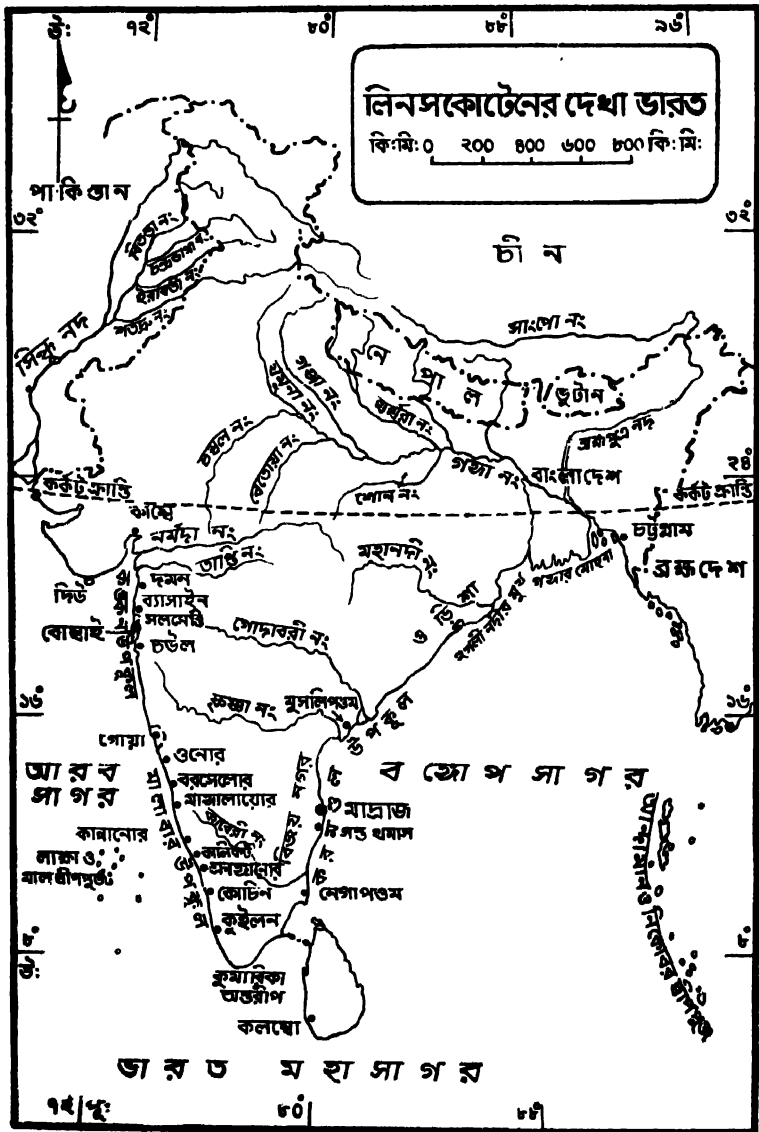
লিনসকোটেন (Linschoten) ও তার ভারত বিবরণ

এক

'অযথা নষ্ট করে চলার মতো এতটুকু সময়ও এখন আর হাতে নেই। দারিদ্র্য কী বস্তু, ভোগ-বিলাস কাকে বলে তা যে জানে না, এ জগতে দেখার ও জানার কী কী আছে না আছে সে সম্পর্কে যার কোন ধারণাই নেই, তেমন এক অজ্ঞান শিশুর মতো মায়ের আঁচলের নিচে জীবন কাটাবার বয়স এখন পার হয়েছি। এখনো ওভাবে জীবন কাটানো মানে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা।'

১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বাইশ বছর বয়সে পা দিয়ে মা-বাবাকে এই কথাগুলি লিখে-ছিলেন লিনসকোটেন।

জীবনকে তিনি কী চোখে দেখেছিলেন, পৃথিবীকে দেখা ও জানার আকাঙ্খা তার মনে কতো গভীর ছিল, এ উক্তি থেকেই তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

ছোটবেলা থেকেই ভালবাসতেন তিনি ইতিহাস পড়তে। দেখতেন দুঃসাহসী অভিযানের স্বপ্ন। ফলে—পৃথিবী দেখবার, তাকে চেনা ও জানার বাসনা তার মনে ক্রমেই অতি দুর্বার হয়ে উঠলো।

ষোলো বছর বয়সে পা দিতে না দিতেই, ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, তাই তিনি মা-বাবাকে ছেড়ে পাড়ি দিলেন স্পেনে ভাইদের কাছে।

লিনসকোটেন জাতিতে ছিলেন ডাচ। অর্থাৎ হল্যাণ্ডবাসী। তাদের পরিবারের আদি নিবাস উটরেখট প্রদেশের লিনসকোটেন গ্রামে। তার পুরো নাম জন হিউজেন ভন লিনসকোটেন। তার মানে, লিনসকোটেন গ্রামবাসী হিউজের ছেলে জন। তার বাবা-মা অবশ্য সেখানে থাকতেন না। হারলেমে এসে বসবাস শুরু করেন। লিনসকোটেনের জন্ম তাই হারলেম শহরেই। বাবার নাম হিউচ জুসতেন অর্থাৎ জাষ্টিনের ছেলে হিউজ। মায়ের নাম মায়ের্তগেন হেনডরিকস বা হেনরীর মেয়ে মার্থা।

যখন লিনসকোটেন এগারো বছর বয়সে পা দিয়েছেন তখন হল্যাণ্ডবাসীরা স্প্যানিয়ার্ডদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন হলো। স্প্যানিয়ার্ডরা কিন্তু

দমে গেল না তাতে। বরং দ্বিগুণ সংকল্প ও পরাক্রম নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর। তীব্র সংগ্রামের পর দখল করে নিলো হারলেম শহর। শহর ত্যাগ করে লিনসকোটেনকে নিয়ে তার বাবা মা চলে এলেন এনখুইজেন বন্দরে। সেখানেই বসবাস শুরু করলেন। এ বন্দরটি ছিল প্রথম থেকেই মুক্তি আন্দোলনের একটি মূলকেন্দ্র।

লিনসকোটেনের বড় দু'ভাই এ ঘটনার অল্প কয়েকবছর আগেই স্পেনে চলে যান। সেখানে, সেভিল শহরে বোধ হয় ব্যবসা শুরু করেন। ডাচদের সঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডদের যুদ্ধ চললেও, ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। কারো পক্ষেই তা বন্ধ করে দেয়া পুরোপুরি সম্ভব ছিল না। স্পেন ও পর্তুগালের পক্ষে হল্যাণ্ডের বাজার অত্যাবশ্যক ছিল। বিশেষ করে তাদের ভারতীয় ব্যবসা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য।

১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে লিনসকোটেন সেভিলে এলেন তার ভাইদের কাছে। মন দিলেন স্পেনিস ভাষা শেখার দিকে। এর ছয় বছর পর দেখা যায়, তিনি লিসবনে এক সওদাগরের কাছে আছেন। এ সময়ে ব্যবসার বাজার মন্দা দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পর্তুগীজদের ভারতীয় নৌবহরে যোগ দেবেন। ইতিমধ্যে ১৫৮০ অব্দে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে জয়ী হয়ে স্পেন ও পর্তুগাল দুই রাজ্যের আধিপত্য লাভ করলেও, এজন্য স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া রূপে ব্যবসার বাজারে দারুণ মন্দা দেখা দিয়েছিল এ সময়ে। লিনসকোটেনের এক ভাইও এজন্য ব্যবসা ছেড়ে ভারত-গামী এক বাণিজ্য নৌ-বহরে কেরাণীর চাকুরী নিতে বাধ্য হয়েছেন। তারই চেষ্টাচরিত্রের ফলে গোয়ায় সদ্য-নিযুক্ত আর্ক-বিশপ ভিনসেন্ট ডি ফনসেকার ব্যক্তিগত কর্মচারীদের দলে চাকুরী পেয়ে গেলেন লিনসকোটেন। আর্ক-বিশপ তখন এই নৌবহরের একটি জাহাজে করেই ভারতে, গোয়ায় চলেছেন। দুঃসাহসী অভিযান-প্রিয় লিনসকোটেন উৎসাহের সঙ্গে তার সাথী হলেন।

১৫৮৩ অব্দের ৮ই এপ্রিল এই বাণিজ্য নৌবহর ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করলো। ৫ই আগস্ট থামলো এসে মোজাম্বিকে। এ বন্দরটি তখন আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে পর্তুগীজদের একটি প্রধান ঘাঁটি। ভারত ও দূর-প্রাচ্য যাতায়াতের পথে তাদের সব জাহাজই এখানে এসে থামতো। জাহাজ দু সপ্তাহ এখানে রইলো। সেই সুযোগে ঘুরে ঘুরে এখানকার যা কিছু দেখার মতো, জানার মতো তা সবই তিনি দেখলেন ও জানবার চেষ্টা করলেন।

একুশে সেপ্টেমবর জাহাজ-বহর গোয়া নদীতে প্রবেশ করলো। জাঁকজমক করে শহরবাসীরা আর্ক-বিশপকে নিয়ে এলেন শহরে, তার আবাসে।

আর্ক-বিশপের সাথে গোয়াতেই থেকে গেলেন জন লিনসকোটেন। অপর ভাই পর্তুগাল ফিরে চললেন জাহাজে মাল বোঝাই হবার পর।

পাঁচবছরেরও সামান্য কিছু বেশি কাল গোয়ায় কাটালেন জন।

এসময়ে ভারত উপকূলের পর্তুগীজ বসতিগুলি ছাড়া দূর প্রাচ্যে যাবারও প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। মা-বাবার কাছে এক পত্রে তিনি লেখেন : 'চীন জাপান দেখে আসি, আমার খুব ইচ্ছে। পর্তুগাল এখান থেকে যতো দূরে, ও দুটি দেশও ঠিক ততো দূরে। তার মানে, যেতে আসতে তিনটি বছর কাটাতে হবে সাগরে। আর দু'তিনশো খানেক ডুকাট পকেটে থাকলে সহজেই তাকে ছ-সাতশো বানিয়ে ফেলা যায়। এবছর আমার এক ডাচ বন্ধু একটি জাহাজে গোলন্দাজের চাকরি নিয়ে সেখানে গেছে। আমি সাথী হলে দারুণ খুশী হতো সে। শূন্য পকেটে সে রকমটি করা মূর্খামি হবে ভেবেই গেলাম না। যেতে হলে, লাভ তোলার মতো উপযুক্ত সম্বল নিয়েই যাওয়া উচিত। গোলন্দাজ বন্ধুটি আগেও একবার গিয়েছিল সেসব দেশে। তার জন্ম এনখুইজেনে। ছাব্বিশ বছর হলো আছে এ-দেশে। বিয়ে করেছে এক ডাচ-মহিলাকেই। নাম বন্ধুটির ডিরক গেরিৎজ। সাগর থেকে ফিরে দেশে চলে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে তার।'

এই ডিরক-ই 'চীন' নামে খ্যাত হয়ে উঠেছিলেন তার সে-সব দেশ ঘোরার সুবাদে। নিজের লেখা বিবরণী পুস্তক 'ইটিনেরারিয়াম'-এও এর নাম উল্লেখ করেছেন লিনসকোটেন। চীন, জাপান ও তার মধ্যবর্তী-অঞ্চলের যে বিবরণ সেখানে দিয়ে গেছেন তিনি, তাও এই ডিরক-ই তাকে জুগিয়েছে।

ভাগ্য খারাপ জন লিনসকোটেনের। চীন-জাপান ঘুরে দেখার সুযোগ পেলেন না তিনি। ১৫৮৭ অব্দের জানুয়ারী মাসে পর্তুগাল ঘুরে আসার জন্য জাহাজে চাপলেন আর্ক-বিশপ। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে রাজার কাছে বক্তব্য পেশ করাই ছিল এ যাত্রার লক্ষ্য। আবার ফিরে আসবেন বলে লিনসকোটেনকে তিনি তার আবাসেই রেখে গেলেন। নিযুক্তি দিলেন উচ্চতর সম্মানকর ও লাভদায়ক পদে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরের বছর সেপটেম্বর নাগাদ খবর এলো যে লিসবন থেকে যাত্রা করার অল্প কিছুদিন পরেই পথে মারা গেছেন আর্ক-বিশপ।

এ ঘটনার ফলে আর্ক-বিশপের অধীনে কর্মরত লোকজনেরা অসুবিধায় পড়ে গেল ভারতে। তাদের ভবিষ্যত পুরো অনিশ্চিত হয়ে পড়লো। যে লিনসকোটেন এখানেই সারা জীবন কাটিয়ে দেবেন বলে ভাবছিলেন, এবার তিনি তড়িঘড়ি দেশে ফিরে যাবার জন্য বেসামাল হয়ে উঠলেন। একেবারে প্রথম সুযোগটিরই সদ্ব্যবহার করলেন তিনি। ১৫৮৯ অব্দের ২০শে জানুয়ারী তিনি পর্তুগাল ফিরে যাবার জন্য কোচিন-গামী এক জাহাজে চাপলেন। বন্ধু ডিরক গেরিৎজ ও আরো পাঁচজন এ যাত্রায় তার সঙ্গী ছিলেন।

খাদ্য-সম্ভার সংগ্রহ করার জন্য নৌবহর সেন্ট হেলেনায় ভিড়লো। এখানে গেরিট ভন অফহিউজেনের সাথে দেখা হয়ে গেল লিনসকোটেনের। ইনি অ্যানতওয়েরপের অধিবাসী। লিসবনে থাকাকালে পরিচয় হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। গেরিট গিয়েছিলেন মালাক্কায়। চৌদ্দমাস সেখানে কাটাবার পর দেশে ফিরে চলেছেন এবার। কৌতূহলী লিনসকোটেন তার কাছ থেকে সেখানকার এবং তার আশেপাশের দেশ ও দ্বীপগুলির নানা বিবরণ সংগ্রহ করলেন। সেন্ট হেলেনা দ্বীপের এসসেনশন বন্দরটি দেখার পর এই দ্বীপের উপকূলভাগের এক মানচিত্র আঁকলেন তিনি।

২২শে জুলাই এক ইংরাজ নৌবহরের মুখোমুখি হলেন তারা সাগরে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে পর্তুগীজ জাহাজবহর অ্যাজোরেস বন্দরে পৌছাল। এই ইংরাজ নৌ-বহরের জন্যই তারা আবার টেরসেরায় জাহাজ নোঙর করতে বাধ্য হলেন। এ ঋতুতে অতি বিপদজনক স্থান এটি। অল্পদিনের মধ্যেই এ ভুলের মাশুল গুণতে হলো তাদের। আগস্ট চার তারিখে সাগরে ঝড় দেখা দিল। মালাক্কা থেকে আগত জাহাজটি এর ফলে জলে ডুবে গেল। জাহাজটির মালপত্র ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বে ছিলেন লিনসকোটেনের বন্ধু গেরিট। তিনি বিপদে পড়ে লিনসকোটেনকে তার সঙ্গে টেরসেরায় থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। জাহাজটিকে ডুবুরীদের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার করার প্রচেষ্টায় তাকে তার সাথী হতে বললেন। রাজী হলেন লিনসকোটেন।

দু বছরেরও উপর এই দ্বীপে থেকে গেলেন তারা। সেখানকার শাসনকর্তার সাথে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললেন লিনসকোটেন। শাসনকর্তার খুব ভালো লাগলো তাকে। লিনসকোটেন সারা দ্বীপটি ঘুরে ঘুরে নানারকম অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের কাজে নেমে গেলেন। নিজের ঘোড়া দিয়ে এজন্য তাকে সাহায্য

করলেন শাসনকর্তা। এই সাহায্যের দরুনই এখানকার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা ও তা 'ইটিনেরারিয়ামে' দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

১৫৯২ অব্দের ২রা জানুয়ারী লিসবন ফিরে এলেন লিনসকোটেন। প্রয়োজনীয় সব কাজ সেখানে শেষ করে সেতুবল রওনা হলেন। চাপলেন সেখান থেকে নেদারল্যাণ্ডগামী একটি জাহাজে। প্রায় তেরো বছর বাইরে বাইরে কাটাবার পর ফিরলেন নিজেদের বাড়ি, এনখুইজেন। তখন সেপটেমবর মাস। মা-ভাই-বোন সকলে সুস্থ শরীরে বর্তমান। কিন্তু বাবা আর বেঁচে নেই।

দেশে ফিরে এসে নিজের অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এবার 'ইটিনেরারিয়াম' রচনার কাজে মন দিলেন লিনসকোটেন। দেশের আইন-পরিষদ তাকে অনুমতি দিলেন গ্রন্থ-প্রকাশের। এ অনুমতি পেলেন ১৫৯৪ অব্দের ৮ই অকটোবর। কিন্তু নানা কারণে এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ হতে দেরি হলো। দ্বিতীয় খণ্ডটিই প্রকাশ পেল আগে, ১৫৯৫ অব্দে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পেল তার পর ১৫৯৬ অব্দের প্রথমে।

পর্তুগীজ ভারত সহ বিভিন্ন দেশের মূলবৃত্তান্ত প্রথম খণ্ডটিতেই স্থান পেয়েছে। এই বইটির মধ্যে অন্য একজনের লেখা কতকগুলি মন্তব্য বা ব্যাখ্যা দেখা যায়। এগুলি অবশ্য বাঁকা অক্ষরে ছাপা হয়েছে। এই ব্যাখ্যাগুলি লিখেছেন এনখুই-জেনেরই একজন চিকিৎসক। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। নাম বার্নার্ড টেন ব্রোয়েক। তার নাম তৎকালীন রীতি অনুসারে লাটিনে ভাষান্তর করা হয়েছে পালুদানুস (**Paludanus**) রূপে।

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ভারত ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল, আমেরিকার উপকূলভাগ ও পূর্ব সাগরে যাবার পথ-নির্দেশিকা। এগুলি স্পেনিশ ও পর্তুগীজ পথ-নির্দেশকদের পাণ্ডুলিপি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ প্রকাশের আগেই এটি প্রকাশ পায়। আর এ বইটির দ্বারাই লিনসকোটেন প্রকৃতপক্ষে তার দেশবাসীর সর্বাধিক উপকার করেছেন।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি আলাদা একটি ভাগে স্পেনের রাজার অধীনে থাকা সব ভূখণ্ড, সেখানকার শুল্ক, কর, রাজস্ব ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। রয়েছে সেই সাথে সরকারের গঠন ও প্রশাসন ধারা, সামরিক শক্তির বিবরণ এবং পর্তুগালের রাজ-পরিচিতি।

তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ও আমেরিকার বর্ণনা। পূর্ববর্তী বিভিন্ন বিশিষ্ট লেখকদের বর্ণনাকে ভিত্তি করে এটি রচিত।

প্রথম খণ্ডের মূল সংস্করণে ৩৬টি চিত্র ও নক্সা দেয়া হয়েছিল। সবগুলিই লিনসকোটেনের নিজের আঁকা এবং তার ভাইদের ও অপর এক ব্যক্তির খোদাই করা। এ ছাড়া ৬টি বড় মানচিত্রও ছিল। চিত্রগুলি বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের রীতিনীতি আচার-উৎসব-অনুষ্ঠানের এবং স্থানীয় কৃষি ও শিল্প পণ্যাদির। বেশির ভাগই গোয়া ও তার আশেপাশের। নক্সাগুলির মধ্যেও গোয়ার নক্সা ছিল এবং বেশ বিশদভাবে আঁকা। মানচিত্রের মধ্যে ছিল দক্ষিণ-এশিয়ার পশ্চিম ও পূর্ব ভাগের মানচিত্র।

১৫৯২ অব্দের সেপটেমবরে লিনসকোটেন নিজের দেশ হল্যাণ্ড ফিরে আসেন। এ সময়ে উত্তর এশিয়া দিয়ে ভারত যাবার একটি সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কারের জন্য মিডেলবার্গ (জীল্যাণ্ড)-এর এক ব্যবসায়ী উৎসাহী হয়ে উঠলেন। নাম তার ব্যলথসর ডি মউকিরন। বহুকাল ধরে ইনি রাশিয়ার উত্তর উপকূলে বাণিজ্য করে চলছিলেন। ১৫৯৩ অব্দে তিনি তার পরিকল্পনা দেশের আইন-পরিষদের কাছে ও অরেঞ্জের রাজকুমারের কাছে পেশ করলেন। তাদের সাহায্য ও সমর্থন চাইলেন। পরিকল্পনা অনুমোদন পেল। ঠিক হলো তিনটি জাহাজ এই অভিযানে যাবে। এর একটি তৈরী হবে মিডেলবার্গে, একটি এনখুইজেনে ও আরেকটি অ্যামাসটারডামে।

এই পরিকল্পনার একজন বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন ফ্রানসিস ম্যায়েলসন। ইনি পূর্বে এনখুইজেনের অবসর বৃত্তিভোগী ছিলেন। বর্তমানে অরেঞ্জের রাজকুমারের পরামর্শদাতা। অতি সুদক্ষ ও প্রভাবশালী নেতা ইনি। লিনসকোটেনের সাথে এর পরিচয় ছিল, তাকে বন্ধুর মতো অনেক সাহায্য-সহায়তাও দিয়েছেন ইনি। এই ম্যায়েলসনের চেষ্টা ও আগ্রহে অভিযাত্রী দলে স্থান পেলেন লিনসকোটেন। এনখুইজেনে তৈরী জাহাজটিতে পণ্য ও বাণিজ্য অধিকর্তার পদ দেয়া হলো তাকে। এই সাথে নির্দেশ দেয়া হলো, তিনি যেন এই অভিযানের বিশদ রোজনামচা লিখে রাখেন। জাহাজ তিনটি অভিযানে বার হলো ১৫৯৪ অব্দের ৪ঠা জুন। ফিরে এলো সেই বছরেই, সেপটেমবর মাসে।

ফিরে আসার পর লিনসকোটেন রাজকুমার মরিস ও শাসন-পরিষদের কাছে পত্র লিখে অভিযানের বিবরণ জানালেন। রাজকুমার ও সরকারের প্রধান জন ভন ওলডেনকারনেভেলট তার কাছ থেকে মৌখিক ভাবে সব বিবরণ শোনার জন্য হেগ-এ ডেকে পাঠালেন। গেলেন লিনসকোটেন। এ সময় তিনি তার লেখা রোজনামচাটি উপহার দিলেন তাদের। এটি অতি বিশদ ও কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনায় পূর্ণ। বই আকারে পরে প্রকাশ করা হয়েছিল এটিকে।

লিনসকোটেনের মনে স্থির বিশ্বাস দেখা দিয়েছিল যে এ অভিযানে তারা উত্তর দিক দিয়ে ভারত যাবার পথ আবিষ্কার করতে পেরেছেন। দেশবাসীদের অনেককেও তিনি তার এই বিশ্বাসের ভাগীদার করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই পরের বছর সাতটি জাহাজ নিয়ে এ পথে ভারত যাবার ব্যবস্থা করা হলো। ১৫৯৫ অব্দের ২রা জুলাই টেক্সেল থেকে যাত্রা করলো এই বহর। এতে নিযুক্ত দুজন প্রধান মহাধ্যক্ষ মধ্যে একজন হলেন লিনসকোটেন। কিন্তু বরফের জন্য কর সাগরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হলো এই জাহাজ-বহর। এ অভিযানেরও যে রোজনামচা লিনসকোটেন রেখেছিলেন তা এখনো রক্ষিত আছে, বইয়ের আকারে প্রকাশও করা হয় তাকে।

উত্তর দিক থেকে ভারত যাবার এই দ্বিতীয় অভিযান শুরু করার আগেই পর্তুগীজদের পথ ধরে ডাচ নৌবহর প্রথম ভারতের অভিমুখে যাত্রা করে ও সফল হয়। অন্য দিকে ভারতের উপর লেখা লিনসকোটেনের অসামান্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তার পরের বছর ১৫৯৬ অব্দে। এ থেকে মনে হতে পারে যে ডাচ বণিকদের এই প্রচেষ্টার সাথে লিনসকোটেনের লেখার বুঝি কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা ঠিক নয়। তার বইয়ের যে খণ্ডটিতে ভারতের সাগর পথ-নির্দেশিকা রয়েছে সেই দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৫৯৫ অব্দে এই যাত্রার আগেই প্রকাশ পেয়েছিল। এ বইটি যে এই অভিযান-কারীদের সঙ্গে ছিল ও ব্যবহার করা হয়েছিল, অভিযানের বিবরণী থেকে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া এও স্পষ্ট যে অন্তরীপের পরবর্তী পথ লিনসকোটেনের মতামত অনুযায়ী-ই বাছা হয়েছিল। বোধ হয় যাত্রার পূর্বে অভিযানকারীরা লিনসকোটেনের সাথে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা পরামর্শ করেছিলেন।

উত্তর দিক দিয়ে দ্বিতীয়বারের ব্যর্থ অভিযানের পর লিনসকোটেন আর সাগর অভিযানে বার হননি। তবে, সে উৎসাহে কখনো তার ভাঁটা পড়েনি। সমৃদ্ধিবান এনখুইজেন বন্দরটি তার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। বারনারড পালুদানুস, লুকাস জানজওয়াগহেনেরের মতো বন্ধুও পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। জুটে গেল শহরের কোষাধ্যক্ষের পদটি। অতএব কোন অসুবিধা হলো না।

পালুদানুস কে ছিলেন সে-কথা আগেই বলেছি। ওয়াগহেনের হলেন সে কালের সব থেকে সেরা পথ-নির্দেশিকাটির লেখক। এটি প্রকাশ পায় ১৫৯৮ অব্দে। বইটির মুখবন্ধে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য তিনি লিনসকোটেনের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

এই বছরেই লিনসকোটেন বিশিষ্ট জেসুইট জোসেফ ডি অ্যাকোসটার লেখা **Historia natural y moral de las Indias** বইটির ডাচ অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড সরকার একটি ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী গঠনে উৎসাহ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকা ও আফ্রিকা উপকূলে ব্যবসা করা ও স্প্যানিয়ার্ডদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভাব-প্রতিপত্তির উপর আঘাত হানা। এজন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়। সে কমিটিতেও লিনসকোটেনের নাম দেখা যায়। স্পেনের সাথে বারো বছর ব্যাপী এক চুক্তি সম্পাদিত হবার ফলে এ পরিকল্পনা সাময়িকভাবে বাধা পায় শেষ পর্যন্ত।

লিনসকোটেনের বই প্রকাশের জন্য দেয়া অনুমতি-পত্র ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে আবার অনুমোদন করা হয়। এ সময়ে লিনসকোটেন তার অবদানের দ্বারা মাতৃভূমির সেবার জন্য বিশেষ স্বীকৃতি ও সম্মান লাভের আশা করেছিলেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখতে গেলে এক্ষেত্রে তার অবদান অসামান্য ছিল। তার 'ইটি-নেরারিয়াম'-ই ডাচদের ভারত ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আসার চাবিকাঠি জুগিয়েছিল। আবার উত্তর সাগর অভিযান তার সমূহ-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হলেও, মেরু সাগর ও উত্তর উপকূল সম্পর্কে আগের তুলনায় অনেক বেশি জ্ঞান হাসিল করতে সাহায্য করেছিল। এ সবের প্রতিদানে তিনি শাসন-পরিষদের কাছে বার্ষিক বৃত্তি প্রার্থনা করেছিলেন শুধু। কিন্তু বেদনার বিষয়, শাসন-পরিষদ তাকে তার এই বই প্রকাশের অধিকার দানই এ জন্য যথেষ্ট পুরস্কার বলে মনে করলো। তাকে বৃত্তি দিতে অস্বীকার করা হলো। দিলেও, তা অবশ্য তিনি বেশিকাল ভোগ করতে পারতেন না। কেননা, পরের বছরই, ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেবরুয়ারী, মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তার কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

হল্যাণ্ডের বাইরে লিনসকোটেনের খ্যাতি বিশেষ করে 'ইটিনেরারিয়ামে'র লেখক হিসাবেই। কতকদিক থেকে তার এই বইখানিকে এক বিপ্লবকর অবদান রূপে আখ্যা দেয়া যেতে পারে। এটি প্রকাশ পাবার পর য়ুরোপের প্রত্যেক জাতি জানতে পারলেন, পর্তুগীজদের উপনিবেশ ও বাণিজ্য সাম্রাজ্যের শিকড়ে পচন ধরেছে। উদ্যমশীল কোন প্রতিযোগী বিশেষভাবে সচেষ্ট হলে এবার তার পতন ঘটাতে পারে। এছাড়াও বইটির মধ্যে রয়েছে ভারত ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যাবার চাবিকাঠি। বইখানির অসামান্য মূল্য তাই সাথে সাথে ব্যাপক

স্বীকৃতি পেল। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বইখানির ইংরাজী ও জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হলো। পরের বছর প্রকাশ পেল দু-দুখানি ল্যাটিন অনুবাদ। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী অনুবাদও প্রকাশ পেল। মূল ডাচ সংস্করণ ও ফরাসী সংস্করণ একাধিক-বার পুনর্মুদ্রিত হয়। দীর্ঘকাল ধরে তার বইখানি এ অঞ্চল সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে এসেছে। পরে, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে, ভারত সম্পর্কে আরো জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে অধিকতর নির্ভুল ও ব্যাপক তথ্য সমৃদ্ধ এবং বিধিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত গ্রন্থ এর স্থান নিতে শুরু করে। এসত্ত্বেও ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের ভারতের যে চিত্র এতে রয়েছে তার মূল্য সমান থেকে গেছে, এতটুকু কমেনি। এদিক থেকে তার বইখানিকে অতুলনীয় ও অগ্নিগর্ভ বললে বোধ হয় বাড়িয়ে বলা হয় না।

এতদিন ভারত ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পর্তুগীজ ছাড়া অন্য কোন য়ুরোপীয় জাতির উপনিবেশ ও ব্যবসা ছিল না। লিনসকোটেনের বই প্রকাশের পর সে প্রচেষ্টা জোরদার শুরু হলো। ১৫৯৫ থেকে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ডাচরা পনেরো বার এ অঞ্চলে বাণিজ্য অভিযান চালালো তাদের জাহাজ বহর নিয়ে। ইংরেজরাও পিছিয়ে রইলো না। অবশ্য এর আগেই ভারত আসার পথ তারা আবিষ্কার করে ফেলেছিল। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাংকেসটার উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে ভারতের কুমারিকা অন্তরীপ ও মালয় অঞ্চল ঘুরে যান। এ সত্ত্বেও লিনসকোটেনের বইটি যে অনেক সাহায্য করেছিল এবং প্রেরণা জুগিয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় পর্তুগীজ একাধিপত্য ক্ষুন্ন করে ডাচ ও ইংরেজরাও তাদের বাণিজ্য-উপনিবেশ গড়ে তুললো। এলো তাদের দেখাদেখি ওলন্দাজ আর ফরাসীরাও। তার পরের ইতিহাস সকলেই জানি আমরা।

দুই

লিনসকোটেন ভারতে পদার্পণ করেন ১৫৮৩ অব্দের ২১শে সেপটেমবর। স্বদেশ ফিরে যাবার জন্য কোচিনগামী জাহাজে চাপেন ১৫৮৯ অব্দের ২০শে জানুয়ারী। অর্থাৎ পুরো পাঁচ বছর চার মাস তিনি এদেশে থাকেন।

এসময়ে দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করছেন প্রবল পরাক্রান্ত মোগল বাদশা আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ)। লিনসকোটেন এদেশে পদার্পণের আগেই কাম্বে বা গুজরাট এবং বাঙলা সহ প্রায় সমস্ত উত্তরাপথে তিনি তার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাকি শুধু কাশ্মীর, নিম্ন সিন্ধু এলাকা ও ওড়িশা। এর মধ্যে কাশ্মীরও ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য ইতিমধ্যেই তিনি তার সর্বধর্ম-সহনশীলতার উদার নীতি গ্রহণ করেছেন। মাত্র তিন বছর আগে ১৫৮০ অব্দে খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে তার জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্য তিনি তিন জেসুইট মিশনারীকে আমন্ত্রণ করে গোয়া থেকে তার ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদে নিয়ে গেছেন।

দাক্ষিণাত্যে তখন একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলতে বিজয়নগর। কিন্তু তার রাজ্যসীমা এবং পরাক্রম দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। বর্তমান এছাড়া চার স্বাধীন মুসলমান রাজ্য। আহমদ নগরের নিজামশাহী; বিজাপুরের আদিল-শাহী, বীদরের বারীদশাহী ও গোলকুণ্ডার কুতবশাহী। আর, প্রায় সব সময়েই এরা নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করে চলেছে।

লিনসকোটেনের আগ্রহ ও কৌতূহল প্রধানতঃ পর্তুগীজ ভারতের মধ্যেই সীমিত ছিল। আবার, রাজ-ইতিহাসের তুলনায় সমাজ ইতিহাস, সাধারণ মানুষের রীতিনীতি, জীবনযাত্রা প্রণালী জানার দিকেই তার কৌতূহল বেশি ছিল বলে মনে হয়। এ কারণেই তার বিবরণে এসব স্থানীয় রাজ্যের ইতিহাস ও সমকালীন রাজাদের স্পষ্ট নামোল্লেখ দেখতে পাই না। এমন কি সম্রাট আকবরের নাম পর্যন্ত অনুপস্থিত। দিল্লীর মুসলমান রাজ্যের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা যেমন অস্পষ্ট ও ভাসাভাসা তেমনি নির্ভুল তথ্য-নির্ভর নয়। এই বর্ণনার অধিকাংশই তিনি আবার জেসুইট পাদ্রী আকোসটার বই থেকে নিয়েছেন। এ কারণে, অপ্রয়োজনীয় বোধে, ওই বিবরণ এ সংকলন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

দক্ষিণী রাজাগুলির রাজ-ইতিহাস ক্ষেত্রেও লিনসকোটেন যতটুকু যা বলেছেন তা সবসময় তথ্য-নির্ভর নয়। লোকমুখে শোনা কথা। এবং কোন-রকম প্রশ্ন উত্থাপন না করেই সেগুলি তিনি বইয়ে স্থান দিয়েছেন। যেমন, সন্ত থমাসের সময়ে বিজয়নগর রাজ্যের অস্তিত্ব।

ভারতীয়দের পৌত্তলিক ধর্মানুরক্তিকেও তিনি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এ সম্পর্কে তার উৎকট অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া তার সৌন্দর্য বোধকেও মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বোধহয় চার্চের সঙ্গে তার এ সময়-কার সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতাই এর একটি কারণ।

অথচ তিনি যে প্রবল মানবিক হৃদয়বৃত্তি ও অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, পর্তুগীজ গোয়ার দরিদ্র ও নীচু শ্রেণীর ভারতীয়দের এবং আরবীয় ও আবেসিনীয় নাবিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেরূপ ক্ষুব্ধ ও স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন সেজন্য তার প্রতি শ্রদ্ধাবনত না হয়ে পারা যায় না। তার পূর্বে বহু বিদেশী পর্যটক এ দেশে এসেছেন। কিন্তু তাদের কজন এদেশের সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনী শুনিয়েছেন? শুনিয়েছেন তাদের দুঃখ-দুর্দশা জীবন যন্ত্রণার কথা? তারা শুধু প্রাচুর্যের কাহিনীই শুনিয়েছেন আমাদের, শোনাননি বঞ্চনার ইতিহাস। এদিক থেকে লিনসকোটেন অবশ্যই এক ব্যতিক্রম।

এক ঃ সিন্ধু

হরমুজ থেকে পূব উপকূল বরাবর জাহাজ দক্ষিণদিকে এগিয়ে চলার পর দেখা পাওয়া গেল আইজাক অন্তরীপের। পূর্বকালে নাম ছিল এর কারপেল্লা। সে সময়ে এদিককার ভূভাগকে বলা হতো কারমানিয়া। এ অন্তরীপটির অবস্থান সাড়ে পঁচিশ ডিগ্রীতে। দূরত্ব হরমুজ থেকে তিরিশ মাইল।

[এখানে বলে নেয়া ভালো যে লিনসকোটেনের বলা মাইলকে যেন ১৭৬০ গজের ইংরেজ মাইল বলে ভুল করা না হয়। এ হলো স্পেনিশ মাইল যা ৩⅔ ইংরেজ মাইলের সমান।]

এই তীর বরাবর এগিয়ে যেতে যেতে সিন্ধু নদের দেখা পাওয়া গেল। ইতিহাস লেখকেরা একে বলে থাকেন 'ইণ্ডাস'। লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলাম গঙ্গানদীর উৎসস্থল ককেশাস (হিমালয়) পর্বতমালা থেকেই জন্ম নিয়েছে এ নদীটি। গঙ্গানদী বাঙলা রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে এসে মিশেছে। এই বাঙলা রাজ্যের কথা পরে বলবো। কতক লোক জানালো, এই সিন্ধু বা ইন্দু থেকেই নাকি 'ইণ্ডিয়া' নামটির উৎপত্তি হয়েছে।

সিন্ধু মোহনার অবস্থান ২৪ ডিগ্রীতে। আইজাক অন্তরীপ থেকে এর দূরত্ব ১৪০ মাইল। এই নদীকূল বরাবর অঞ্চলের নাম সিন্ধু। এ থেকেই পর্তুগীজেরা সিন্ধু নামকরণ করেছেন এ নদীটির। এখানকার মাটি অতি সরস ও উর্বরা। উৎপন্ন পণ্যাদি আশেপাশের দেশগুলিতে রপ্তানি করে থাকে এরা। ভারত ও হরমুজের পর্তুগীজদের সঙ্গেও বাণিজ্যিক লেনদেন করে থাকে। এরা অতি উন্নত ধরনের নানারকম মিহি সুতীকাপড় তৈরী করে। নাম দিয়েছে তারা এর ঝোরি (Jhoriins—Jhorya)। এছাড়া এক ধরনের মসলিনও মেলে। তাকে বলে এরা ভোলান্ত (Volantes)।

প্রচুর নারকেল তেল আর ঘি পাওয়া যায় এখানে। এই ঘি অতি উৎকৃষ্ট হলেও হল্যাণ্ডের মাখনের মতো স্বাদু ও পরিষ্কার নয়। মাটির তৈরী বড় বড় পাত্রে করে একে তারা নিয়ে আসে। পাত্রগুলির মুখ বেশ ছোট। খাদ্যদ্রব্যাদি রান্না করার পক্ষে এই ঘি চমৎকার।

পিচ, আলকাতরা, আখের মিছরি, লোহা এবং অতি সরেস জাতের চামড়াও এখানে পাওয়া যায়। এই সব চামড়ার উপরে নানা রঙের রেশমের সুতো দিয়ে

অতি নিপুণভাবে ফুল-লতা-পাতা ও মূর্তির কাজ করে তারা। ভারতে এই সব জিনিষের খুব কদর। বিছানা ও টেবিলের আচ্ছাদনী হিসাবে বা গালিচার বদলে এর ব্যবহার করা হয়। ডেস্ক, কাপড়িস রাখার আলমারী, ধন-সম্পদ-গহনা রাখার বাক্স, জিনিষপত্র রাখার বাক্স ও এই জাতের আরো হাজার রকম জিনিষ তৈরী করে এরা। সীসার পাতের উপর ঝিনুক (mother of Pearl) খচিত করে এগুলি বানানো হয়। সারা ভারতে এগুলি বিক্রীর জন্য যায়। বিশেষ করে পর্তুগীজ জাহাজগুলি যখন পণ্য নিতে আসে তখন তারা গোয়া আর কোচিনে নিয়ে যায় এগুলি।

সিন্ধু-মোহনায় কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ পার হবার পর দেখা মিলবে একটি ছোট উপসাগরের। নাম এর জাকোয়েতা (কচ্ছ উপসাগর)। এই উপসাগরের মাঝেও অনেকগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে দ্বীপ রয়েছে। এখানে এমন আচমকা আচমকা জোয়ার ভাঁটা খেলে ও তার চেহারা এতো ভয়ংকর যে পৃথিবীর আর কোথাও এর তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যাপারটি এতো অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য যে সকলেই একে অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করেন। ভারতীয় (মুসলমান)-রা বলেন যে মহান আলেকজেণ্ডার এখানে এসেছিলেন। কিন্তু এখানকার জলস্রোতের তীব্র গতি ও প্রখরতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। একে অলৌকিক দুর্ভাগ্যের দৈব-সংকেত রূপে বিচার করে এখান থেকেই ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এই উপসাগর অঞ্চলটি সিন্ধু মোহনার পর ষাট (ডাচ) মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই উপসাগর পার হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ধরে বরাবর এগিয়ে গেলে দিউ নামের দ্বীপ, শহর ও দুর্গের দেখা পাওয়া যাবে। এটি একটি পর্তুগীজ বসতি। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে এখানে তারা বাস করে। বসতিটি পর্তুগীজ সরকারের অধীন।

দুই ঃ দিউ দ্বীপ, শহর ও বন্দর

দিউ দ্বীপ ও শহর সিন্ধুনদ থেকে সত্তর (ডাচ) মাইল দূরে, একুশ ডিগ্রীতে অবস্থিত। মূল ভূ-ভাগের একেবারে কাছেই। আগে এটি কাম্বের রাজার অধীনে ছিল। তার রাজ্য সীমানা মধ্যে সাগর উপকূলে এ দ্বীপটি।

রাজার অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে এখানে একটি দুর্গ গড়ে তোলেন পর্তুগীজেরা। তারপর কালক্রমে শহর ও পুরো দ্বীপটিকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসেন। স্থানটিকে তারা রীতিমতো সুরক্ষিত করে তুলেছেন, অপরাজেয় বললে ভুল হবে না।

কাম্বের সেনাবাহিনী দু-দুবার অবরোধ করেছে এ দুর্গটিকে। প্রথম ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৫৩৮ খ্রী:)। পরে আবার ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। দুবারই অতুলনীয় পরাক্রমের সাথে তাদের প্রতিরোধ করেছে পর্তুগীজেরা। স্থানীয় বিবরণী থেকে অন্তত: এই কথাই জানা যায়।

শহরে একটি বিরাট পোতাশ্রয় রয়েছে। লেগে রয়েছে সব সময়ে জাহাজের বিরাট ভিড়। তাই বলে বন্দর হিসাবে কিন্তু এর তেমন কিছু সত্যিকারের গুরুত্ব নেই। নেহাৎ সিন্ধু আর কাম্বের মাঝপথে রয়েছে বলেই যা কিছু এর রবরবা। ওই দুটি দেশে সব রকম জিনিষের প্রাচুর্য থাকার দরুনই দিউতে সব সময় নানা দেশীয় আগন্তুক ও জাহাজের ভিড়। তুরকী, পারসিক, আরবীয়, আরমেনীয় ও অন্যান্য অনেক দেশ থেকে বণিকেরা এখানে আসে। ভারতীয় অঞ্চলগুলির মধ্যে এখান থেকেই (পর্তুগালের) রাজা সব থেকে বেশি রাজস্ব পেয়ে থাকেন। এ-বন্দরটি কাম্বে যাবার মুখে পড়ে বলে বেনিয়া, গুজরাটি, রুমো (তুরকী), পারসিক প্রভৃতি যারাই কাম্বে ও মক্কা বা লোহিত সাগর মধ্যে যাতায়াত করেন তাদের সকলেই সাধারণতঃ এখানে এসে থামেন, পণ্য কেনা-বেচা, খালাস ও বোঝাই করেন।

হরমুজ ও অন্যান্য ভারতীয় পর্তুগীজ অঞ্চলগুলির মতো দিউতেও পর্তুগীজরা দেশীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে। তবুও, (অধিক সতর্কতা হিসাবে) দুর্গটিকে সব সময় সুরক্ষিত অবস্থায় রাখে। দ্বীপটিতে সবরকম খাদ্য পদার্থের প্রাচুর্য বর্তমান। গরু, বাছুর, শুয়োর, ভেড়া, মুরগি কোন কিছুরই অভাব নেই।

আছে ঘি, দুধ, পেঁয়াজ, রসুন, ডাল, শুঁটি ইত্যাদি সব কিছুই। এবং বেশ অঢেল। মানের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট। নিচু ভূ-ভাগের অন্য কোন অঞ্চলে এর চেয়ে ভালো জিনিষ আর কোথাও উৎপন্ন হয় না।

এখানে পনীর থাকলেও তা বড় বেশি শুকনো ও নোনতা। মাছ রয়েছে প্রচুর। একে এরা নুনে জারিয়ে রাখে। নোনতা লিঙ বা কড মাছের মতোই খেতে লাগে। অন্যান্য ধরনেরও আছে। শুকনো মাংসও বানায় এরা। এগুলি খেতে বেশ স্বাদু। পুরো সমুদ্র যাত্রার মধ্যেও এ মাংস নষ্ট হয়ে যায় না।

এসব খাদ্য পদার্থ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষপত্র এখানে এতো বেশি উৎপন্ন হয় যে স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে এগুলি তারা নিকটবর্তী অঞ্চলেও পাঠিয়ে থাকে। বিশেষ করে গোয়া ও কোচিনে। ওই দুটি অঞ্চলে আবার ঘি, তেল, শুঁটি, পেঁয়াজ, রসুন এ সবের বেশ অভাব রয়েছে। নেই ডাল, গম ইত্যাদি সব খাদ্য-শস্যও। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আমদানি করে প্রয়োজন মেটাতে হয়।

দিউ থেকে সমুদ্রতীর ধরে পনের-ষোল (ডাচ) মাইল মতো এগিয়ে গেলে আপনি পেয়ে যাবেন কাম্বের মোহনা। এই জল-প্রবাহ মোহনা অঞ্চল থেকে ভিতর পর্যন্ত সব জায়গাতেই ১৮ (ডাচ) মাইলের মতো চওড়া, লম্বায় ৪০ (ডাচ) মাইলের মতো। এটি উত্তর-পূর্বাভিমুখী হয়ে উত্তরে চলে গেছে। আর, এর শেষ সীমাতেই কাম্বে শহরটি। শহরের নাম থেকেই পুরো রাজ্যেরও ওই রকম নাম হয়েছে। শহরটির অবস্থান তেইশ ডিগ্রীতে। এ দেশের রাজা বা সুলতানের রাজধানী এখানেই।

তিনঃ কাম্বে

ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে কাম্বের ভূমিই সব থেকে সুফলা। আশেপাশের সব কটি দেশেই এখান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যায়। এজন্য কাম্বে শহরটিতে সব সময়ে জাহাজের স্রোত লেগে রয়েছে। সর্বক্ষণ সেখানে স্থানীয় অধিবাসী, অন্যান্য ভারতীয়, পর্তুগীজ, পারসিক, আরবীয়, আর্মেনীয় প্রভৃতি প্রতিবেশীদের ভিড়।

কাম্বের রাজা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। মূল অধিবাসীদের বেশির ভাগই গুজরাটি ও বেনিয়া। এরা নিরামিষ ভোজী। সারা ভারতবর্ষ মধ্যে এরাই সব থেকে চতুর ও কুশলী বণিক।

সবরকম খাদ্য-পদার্থই প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এখানে। চাল-ডাল জাতীয় শস্যাদি, ঘি, তেল প্রভৃতি সব কিছুই তারা এখান থেকে প্রতিবেশী দেশগুলিকে জোগায়। মেলে বিভিন্ন প্রকারের প্রচুর সূতীকাপড়। কন্নেকুইন (খণ্ডকী), বোফেতা (বাফতা=বস্ত্র), চৌতারে (চাদর), জোরী, কোটোনিয়া (কত্তান) ইত্যাদি বিভিন্ন রকম তার নাম। এর কতকগুলি ক্যানভাসের মতো। পাল ও ঐ জাতীয় সব জিনিষ তৈরীর কাজে লাগে। আছে এছাড়া আরো নানা ধরনের কাপড়। সেগুলি যেমন সরেস তেমনি দামেও শস্তা। কয়েক জাতের কাপড় এতো মিহি করে বোনা হয় যে তার জমিনের সুতা চোখেই দেখা যায় না। সূক্ষ্মতায় এসব কাপড় হল্যাণ্ডের যে কোন কাপড়কে হার মানায়।

অনেক গালিচাও তৈরী হয় এখানে। নাম তার অলকাতিফা। হরমুজে পারস্য থেকে যে সব গালিচা আসে এগুলি অবশ্য তার মতো সরেস ও সুন্দর নয়। ব্যানকোয়ে নামের আরো এক ধরনের নীরস গালিচা বোনা হয়। স্কটল্যাণ্ডের ডোরাকাটা আচ্ছাদনীর মতো দেখতে অনেকটা। সিন্দুক, আলমারী এসব ঢাকা দেবার কাজে ব্যবহার করা চলে।

আরো এক ধরনের আচ্ছাদনী তৈরী হয় এখানে। নাম এর গোদোরিন কোলচা (গুদরি বা লেপের খোল)। এগুলি সত্যিই খুব সুন্দর, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিভিন্ন রঙের সূতী ও রেশমের সুতা দিয়ে এগুলি কারুকাজ করা। কারুকাজও রকমারি ধরনের, অসংখ্য রকমের। ভারতীয়রা এগুলি তাদের খাটে বিছায়, এর উপর বিছানা পাতে।

বিভিন্ন ধরনের খাট, ভারতীয় মেয়েদের জন্য বসার চৌকি ও এ জাতীয় নানারকম আসবাবও এখানে পাওয়া যায়। এগুলির উপর নানারকম মূল্যবান ও কষ্টসাধ্য কারুকাজ করা, নানারকম রঙের পদার্থ বসিয়ে সুশোভিত করা। চমৎকার চমৎকার সব খেলার টেবিল, হাতির দাঁতের তৈরী দাবা খেলার ছক, কুশলী কারুকার্য শোভিত কচ্ছপের খোলস দিয়ে তৈরী ঢাল; সুন্দর সুন্দর ক্ষুদে সীল-মোহর, বিভিন্ন ধরনের আঙটি, হাতির দাঁত, সিন্ধুঘোটকের দাঁত ও তৈলস্ফটিক দিয়ে তৈরী নানা চোখ জুড়ানো জিনিষ এখানে অজস্র পরিমাণে মেলে।

এক রকমের স্ফটিক পাথর দিয়ে তারা বিভিন্ন রকমের ছোট সীল-মোহর, বোতাম, পুঁতি ও আরো নানারকমের সব জিনিস তৈরী করে।

বিভিন্ন জাতের দামী দামী রত্ন-পাথরও মেলে এখানে। যেমন ধর, **Espinelles, Rubis, Granadis, Jasanites, Amatistes, Chrysolites, Olhos de gato, Cattes eyes, Agates,** প্রচুর জ্যাসপার **(Jasper)** পাথর, শ্বেতপাথর, ও আরো নানা জাতের পাথর।

অনেক প্রকার ওষধিও মেলে এখানে। আফিম, কর্পূর, ভাঙ, চন্দন কাঠ ইত্যাদি। নীল একমাত্র কাম্বেতেই জন্মে। এগুলি এখানে তৈরী হবার পর সারা পৃথিবীতে চালান যায়।

কাম্বের সীমানা শেষ হবার পর শুরু হয়েছে ভারত। শুরু হয়েছে, কঙ্কন ও দাক্ষিণাত্য উপকূল। কাম্বের যে উপকূলভাগ বাঁক নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে চলে গেছে তা কাম্বে শহর থেকে ভারতের মূল উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উপকূল একদিকে পশ্চিমাভিমুখী হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে গেছে। অন্যদিকে দক্ষিণদিক বরাবর 'ইনসুলা দ্য ভাকোয়াস' পর্যন্ত চলে এসেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে এ দ্বীপটি কাম্বে যাবার প্রবেশ মুখে অবস্থিত।

'ইনসুলা দ্য ভাকোয়াস'-এর অবস্থান কুড়ি ডিগ্রীতে। আর এ অঞ্চলেই, মূল ভূভাগের উপর দমন শহর ও দুর্গটি। এ শহরটিও পর্তুগীজদের অধীনে একটি পর্তুগীজ বসতি। দিউ থেকে এর অবস্থান পূর্বাভিমুখী দক্ষিণে ৪০ (ডাচ) মাইল দূরে।

চারঃ ভারত উপকূল এবং সেখানে অবস্থিত বিভিন্ন অঞ্চল ও বন্দর

কাম্বের প্রবেশমুখে অবস্থিত Das Vaquas দ্বীপটি থেকে (প্রকৃত) ভারত উপকূলের শুরু হয়েছে। আগেই বলেছি এটি হলো (ভারতীয় অঞ্চলের) ডান উপকূল। প্রাচ্যের সব দেশেই এই অঞ্চলকে 'ভারত' বলা হয়। কিন্তু (এর অন্তর্গত) প্রত্যেকটি ভূ-খণ্ডেরই আবার স্বতন্ত্র নাম রয়েছে। যেমন: মোজাম্বিক, মেলিন্দ, হোরমুজ, কাম্বে, করমণ্ডল, বাঙলা, পেগু, মালাক্কা ইত্যাদি।

বিশেষভাবে এ কথাটি আপনাদের মনে রাখা দরকার যে (প্রকৃত) ভারত উপকূলের আরম্ভ হয়েছে দমন বা Das Vaquas দ্বীপ থেকে। দক্ষিণ দিকে এই উপকূল ক্রমশঃ পূর্বদিক ঘেঁষে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত চলে গেছে। ওই অন্তরীপই তার শেষ সীমানা। এ অঞ্চলটির বিস্তার সবশুদ্ধ ১৮০ (ডাচ) মাইল (অর্থাৎ দমন থেকে কুমারিকা অন্তরীপ ১৮০ ডাচ মাইল)। এবার যে সব পর্তুগীজ শাসিত বন্দর ও শহরের কথা বলা হবে সেগুলি এই উপকূলেই অবস্থিত।

এসব স্থানে পর্তুগীজদের সুদৃঢ় দুর্গও রয়েছে। প্রথমে দমন। তারপর তার পনের (ডাচ) মাইল পরে ১৯½ ডিগ্রীতে বাসেইন। তার দশ (ডাচ) মাইল পরে ১৯ ডিগ্রীতে চউল শহর ও দুর্গ। সেখান থেকে আরো দশ (ডাচ) মাইল এগিয়ে গেলে ১৮ ডিগ্রীতে দ্যবুল। তারপর তিরিশ (ডাচ) মাইল গেলে গোয়া দ্বীপ। এটির অবস্থান ১৫½ ডিগ্রীতে। এর মধ্যে দ্যবুল ছাড়া আর সবগুলিতেই পর্তুগীজরা বাস করে থাকেন।

দ্যবুল অনেক আগে এক সময়ে পর্তুগীজদের দখলে ছিল (১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে দখল করা হয়, হাতছাড়া হয় ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে)। বহুদিন হলো এটি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

গোয়া থেকে দমন বা কাম্বের বাঁক পর্যন্ত উপকূলকে গোয়াবাসীরা উত্তর উপকূল নাম দিয়েছেন। আর গোয়া থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত উপকূলকে নাম দিয়েছেন দক্ষিণ উপকূল। তবে, এ উপকূলের চলতি নাম হলো মালাবার।

দমন, বাসেইন, চউল প্রত্যেকটি শহরেই ভালো বন্দর রয়েছে। সমগ্র ভারত থেকে অসংখ্য জাহাজ আসে সেখানে। এ সব শহর ও দেশগুলি অতি সুফলা।

চাল, ডাল, অন্যসব খাদ্যশস্য, ঘি, ভারতীয় বাদাম তেল (নারকেল তেল) ইত্যাদি প্রচুর উৎপাদিত হয় সেখানে।

তবে ভারতের কোথাও জলপাই তেল নেই। পর্তুগাল থেকে যতটুকু আনা হয়, তাই যা মেলে।

উপরে যেসব জিনিসের কথা বলা হলো তাছাড়া আরও নানান জিনিস এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কয়েক ধরনের সুতীবস্ত্রও এখানে উৎপন্ন হয়, তবে পরিমাণ খুব কম।

চউল থেকে অসংখ্য বাণিজ্য-পোত হরমুজ, কাম্বে, লোহিত সাগর, সিন্ধু, মাসকাত, বাঙলা প্রভৃতি অঞ্চলে যায়। এখানে অনেক ধনী সওদাগর ও বাণিজ্য-পোত মালিক আছেন।

চউলের কাছেই একটি পুরানো শহর রয়েছে। দেশীয় লোকেরা বাস করে সেখানে। বিভিন্ন রকমের রেশমের কাপড় বোনা হয় ওই শহরে। গ্রোগেরান, সাটিন, তাফতা, সর্সনেট প্রভৃতি সব রকমের কাপড়, আর রকমারি রঙের। এতো পরিমাণে বোনা হয় যে সারা ভারত ও প্রতিবেশী দেশগুলির চাহিদা মেটায় তারা। এর ফলে চউলের অধিবাসীদেরও প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য হয়। তারা চীন থেকে রেশম আনিয়ে তা বিক্রী করে। এ থেকে সুতা ও কাপড় বুনোট করিয়ে ও তা ভারতের সর্বত্র চালান করে প্রচুর উপার্জন করে। এছাড়া ডেস্ক, খাট, মেয়েদের বসার নানা রকমভাবে চিত্রিত চৌকি, এসব ধরনের নানা জিনিষও সেখানে তৈরী হয়। এ সবের ফলে প্রচুর বাণিজ্যপোত চলাচল করে এখানে।

এ অঞ্চলে প্রচুর আদাও জন্মায়। উপকূলের সর্বত্রই। তবে স্থানীয়দের কাছে এর কদর খুবই কম।

যে ভূ-ভাগকে (গোয়ার লোকেরা) উত্তর উপকূল বলে সেখানকার আবহাওয়া বেশ চমৎকার, নাতিশীতোষ্ণ। এ অঞ্চলকেই ভারতের সব থেকে স্বাস্থ্যকর অঞ্চল বলে মনে করা হয়। দিউ শহর ও মালাবার উপকূল অতি অস্বাস্থ্যকর। এখান-কার ভারতীয়রা, কাম্বে অঞ্চলের গুজরাতী ও বেনিয়ারা, দাক্ষিণাত্যের ভিতর অঞ্চলে যেসব দেশ রয়েছে সেখানকার অধিবাসীরা, বল্লগত্তি (Ballagatti) নামের যেসব লোকেরা পাহাড়ী এলাকায় বাস করে, তারা এবং দক্ষিণী ও কানাড়ীরা অনেকটা হলদেটে রঙের। তাদের মধ্যে কতক বেশ ফরসা। অন্যরা বাদামী ঘেঁষা। সমুদ্র উপকূলে যারা বাস করে তারা অবশ্য অন্যরকম। তাদের

রঙ বেশ কালো। এদের আকৃতি, মুখের চেহারা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন পুরোপুরি য়ুরোপীয় লোকদের মতোই।

গোয়ার বারো (ডাচ) মাইল পর থেকে মালাবার উপকূলের আরম্ভ, কুমারিকা অন্তরীপে পৌঁছে তার শেষ। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের মালাবারী বলা হয়ে থাকে। পীচের মতো কালোবরণ তাদের গায়ের রঙ। মাথার চুলও কালো আর তেলতেলে। গায়ের চুলও তাই। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মুখের গড়ন য়ুরোপীয়-দের মতোই সুঠাম। সারা ভারতে (অর্থাৎ পশ্চিম উপকূলে) এরাই সব থেকে ভালো যোদ্ধা। পর্তুগীজদের চরম শত্রু এরাই। শুরু থেকেই এরা তাদের বেগ দিয়ে চলেছে।

এদেশের চেহারাটি আপনাদের একটু ভালো করে বুঝিয়ে দেখা যাক। পর্তুগীজ ভারতের বাইরে এ দেশের যে বিরাট উপকূলভাগ রয়েছে তার পুরোটাই নিচু অঞ্চল এবং পূর্বাপর আট থেকে দশ মাইল মতো চওড়া। আর এই অঞ্চল-টিকেই কঙ্কন বলা হয়। এর পর শুরু হয়েছে উঁচু বা পার্বত্য অঞ্চল, যা ক্রমশঃ মাথা উঁচু করে একেবারে যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে। এই উঁচু অঞ্চল দমন বা কাম্বে থেকে আরম্ভ হয়ে একেবারে কুমারিকায় ভারতের শেষপ্রান্ত অবধি পৌঁছেছে। তারপর একইভাবে তা চলে গেছে যে উপকূলের নাম করমণ্ডল সেই উপকূল বরাবর। এই উঁচু অঞ্চলের উপরিভাগ পুরো সমতল ও ঘরবাড়ি তৈরীর পক্ষে বেশ চমৎকার। ওই অঞ্চলকে বল্লগত্তি ও দাক্ষিণাত্য বলা হয়। সমগ্র অঞ্চলটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত এবং বিভিন্ন রাজা ও শাসনকর্তাদের অধীন। স্থানীয় অধিবাসীদের বলা হয় দক্ষিণী ও কানাড়া। পরে এদের বিশদ বর্ণনা দেয়া হবে।

পাঁচঃ মালাবার উপকূল

মালাবার উপকূলের আরম্ভ হয়েছে গোয়ার দশ (ডাচ) মাইল দক্ষিণে থাকা রুমো অন্তরীপ থেকে। আর, শেষ হয়েছে কুমারিকা অন্তরীপে গিয়ে। পুরো অঞ্চলটি ১০৭ বা ১০৮ (ডাচ) মাইল দীর্ঘ। এবার যে সব পর্তুগীজ বসতির কথা বলা হয়েছে সেগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত। এসব জায়গায় পর্তুগীজদের দুর্গও রয়েছে।

সবার আগে নাম করতে হয় ওনর দুর্গের (হোন্নাবর বা হোনর)। এর অবস্থান পুরো চৌদ্দ ডিগ্রীতে। রুমো অন্তরীপ থেকে দশ মাইল এগিয়ে। পর্তুগীজদের বসবাস রয়েছে এখানে।

এ অঞ্চলে প্রচুর গোলমরিচ হয়। প্রতি বছর পুরো এক জাহাজ বোঝাই গোলমরিচ সংগ্রহ হয় এখান থেকে। তার মানে, পর্তুগীজ ওজনের সাত থেকে আট হাজার কুইন্তার (এক কুইন্তার = ১২৮ পাউণ্ড)। সমগ্র মালাবার ও ভারতের মধ্যে এখানকার গোলমরিচই সব থেকে ভালো আর বড় আকারের।

এ রাজ্য একজন রানীর অধীনে। নাম বাত্তিকোলা (ভাতকল ?)। বাত্তি-কোলা শহরটি ভিতরের দিকে। তবে বেশি দূরে নয়। রানীর রাজধানী সেখানেই। তিনি নিজেই মরিচ বিক্রী করে থাকেন। ওনরের ব্যবসায়ী ও প্রতিনিধিরা তার কাছ থেকেই তা পেয়ে থাকেন। এজন্য ছ' মাস আগে তার কাছে অর্থ জমা দিতে হয়। নয়তো পাওয়া যায় না।

রানার কাছ থেকে নিয়ে আসা এই গোলমরিচ একজন প্রতিনিধি দুর্গে মজুত করে রাখেন। তারপর অপেক্ষা করে চলেন, কবে জাহাজ আসবে সেগুলি নেবার জন্য। প্রচুর চালও মেলে এখানে।

এখানকার দুর্গটিতে সব সময়ে জন-সমাগম হয় না। শুধু গোলমরিচ মজুদ ও জাহাজে বোঝাই করার সময়েই যা। তাও, এই কয়েক বছর ধরে। তার আগে এখানে এ কাজ করা হতো না।

ওনোর থেকে বরশিলোর (বসাক্রর) ১৫ (ডাচ) মাইল। এ স্থানটির অবস্থান তেরো ডিগ্রীতে। এখানেও পর্তুগীজরা বসবাস করেন। প্রচুর চাল আর গোলমরিচ সংগ্রহ হয়ে থাকে।

মাঙ্গালোর বরশিলোর থেকে ৯ (ডাচ) মাইল পর। এর অবস্থান সাড়ে বারো ডিগ্রীতে। এখানেও একটি দুর্গ আছে। পর্তুগীজরা এখানেও বসবাস করেন। বিরাট পরিমাণে চাল ও গোলমরিচ সংগ্রহ হয় এখান থেকে।

মাঙ্গালোরের ১৫ (ডাচ) মাইল পর কানানোর। এটি সাড়ে এগারো ডিগ্রীতে অবস্থিত। মালাবার অঞ্চলে যে কটি পর্তুগীজ দুর্গ রয়েছে এটি তাদের সবার শেষে। এখানেও প্রচুর গোলমরিচ মেলে।

মালাবারীদের একটি দুর্গবিহীন গ্রাম রয়েছে এ অঞ্চলে। অনেক বাড়িঘর সেখানে। একেবারে নিজস্ব রীতিতে তৈরী। এখানে প্রতিদিন একটি বাজার বসে। সব রকমের খাদ্য-দ্রব্য, প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র বিক্রীর জন্য জমা হয় সেখানে। বাজারটি রীতিমতো দর্শনীয়, অনেকটা হল্যাণ্ডের বাজারের মতোই। মুরগি, ডিম, ঘি, মধু, নারকেল তেল, শুয়োর সবকিছুই সেখানে মেলে। এগুলি কানানোর অঞ্চল থেকে আসে। বাজারে প্রচুর পণ্য বিক্রীর জন্য জমা হয়। মানের দিক থেকেও এসব পণ্য সারা ভারতের সেরা। এসব জিনিস এবং আরো নানান সামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। জাহাজের জন্য খুব লম্বা ও অতি সুদর্শন একপ্রকার মাস্তুলও পাওয়া যায় এখানে। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিষ সারা নরওয়ে খুঁজলেও মিলবে না। এতো অসংখ্য পরিমাণেও পাওয়া যাবে না। এগুলি তারা আশেপাশের সব রাজ্যে জোগান দেয়।

কানানোর অঞ্চলটির যে দিকে তাকাও চোখে পড়বে শুধু ঘন সবুজের মেলা, আর তার রূপ মনকে অভিভূত করে দেবার মতোই মনোহর। বড় বড় গাছের সারি দিক-দিগন্ত বিস্তৃত। মাটির বুক নানারকম ফল-ফসল-উদ্ভিদে ভরা। শুরু থেকে শেষ অবধি সারা মালাবার উপকূল জুড়েই এই চোখ জুড়ানো দৃশ্য।

মালাবারবাসীদের মধ্যে সাদা চামড়ার মুরদেরও বসবাস করতে দেখা যায়। মুসলমান ধর্মের অনুগামী এরা। এদের বাণিজ্যপোতগুলির সিংহভাগই লোহিত সাগর অঞ্চলের দিকে যায়।

মুরই বলো আর ভারতীয়ই বলো কেউই পর্তুগীজ অনুমোদন-পত্র ছাড়া এধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে না। পর্তুগীজ বণিকদের নিরাপত্তার জন্য পর্তুগীজ সৈন্যেরা সারা সাগর উপকূল পাহারা দিয়ে ফেরে। পর্তুগীজ অনুমতি-পত্রহীন কোন জাহাজের দেখা পেলেই তা তারা আটক করে, দখল করে নেয়। কাম্বে, মালাবার, সুমাত্রা দ্বীপ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রায়ই এভাবে তারা লোহিত সাগরগামী জাহাজ ধরে আনে।

কানানোরের মুরেরা অবশ্য বাইরে বাইরে পর্তুগীজদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলে। এখানকার পর্তুগীজ দুর্গটির জন্যেই। কিন্তু আড়ালে তারা পর্তুগীজদের চরম শত্রু। যে কোন উপায়ে পর্তুগীজদের হয়রানি ও বিপদে ফেলার জন্য গোপনে তারা মালাবারীদের প্রচুর অর্থ জোগায়। গোয়া ও সারা মালাবার উপকূল জুড়েই এদের চাল-চলন-চরিত্র এই রকম।

কানানোরের আট (ডাচ) মাইল পর কালিকট। এটি পুরো এগারো ডিগ্রীতে অবস্থিত। অতীতে সারা ভারত বা পুরো মালাবার উপকূল মধ্যে এটিই ছিল সব থেকে নামকরা শহর (ও বন্দর)। এটিই হলো এখানকার সামুরাই বা সম্রাটের রাজধানী। পর্তুগীজরা ভারত আবিষ্কারের পর প্রথম দিকে যখন এখানে আসতেন, তখন প্রায়ই তিনি তাদের প্রতারণা করতেন (পুরোপুরি সত্য নয়)। এজন্য তারা কোচিনের রাজার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করলেন। তখন ইনি ছিলেন একজন ছোটখাট রাজা, সামুরাইয়ের অধীন। পর্তুগীজরা যেই উন্নতি শুরু করলো, এদেশে জমির দখল পেলো এবং এভাবে সাগরের উপর তাদের অধিকার বিস্তার করলো তখন থেকেই ধাপে ধাপে কালিকটের পতন আরম্ভ হলো। বাণিজ্যপোতের যাতায়াত ও বন্দর হিসাবে কালিকটের নাম দুই-ই পড়ে গেল। বর্তমানে এটি মালাবারের নগণ্য শহরগুলির একটি।

অন্যদিকে কোচিনের অবস্থা এখন ঠিক বিপরীত। রাজা দিন দিন সমৃদ্ধিশালী হয়ে সামুরাইকে ডিঙিয়ে গেছেন। পর্তুগীজদের সাহায্য-সহায়তা লাভের দৌলতে তিনি এখন আর সামুরাইকে ভয় বা সমীহ করেন না।

কালিকটের দশ (ডাচ) মাইল পর ক্রাঙ্গানোর (কোডুমংগাতুর)। এর অবস্থান সাড়ে দশ ডিগ্রীতে। এখানেও পর্তুগীজদের একটি দুর্গ আছে।

ক্রাঙ্গানোর থেকে দশ (ডাচ) মাইল গেলে কোচিন (আদি নাম কোচ্চি)। এর অবস্থান ঠিক ঠিক দশ ডিগ্রীতে নয়। অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে পর্তুগীজ, ভারতীয়, মালাবারী ও খ্রীষ্টধর্মী ভারতীয়রা। এটি প্রায় গোয়ার মতোই বড়োসড়ো। লোক বসতিও অতি ঘন। বেশ সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে শহরটি। সুদৃশ্য ঘরবাড়ি, গীর্জা, মঠ, খেয়াঘাট, চোখজুড়ানো নদী, একটি চমৎকার খাল ও পোতাশ্রয়। শহর থেকে একটু দূরে একটি ছোট নদী মূল ভূ-ভাগের দিকে চলে গেছে। তারই অপর পাড়ে কোচিন দচিম (Cochin Dacyma) অবস্থিত। এটি কোচিনের উপরিভাগে অবস্থিত ও মূল মালাবার

ভূ-খণ্ডের অন্তর্গত। এখানকার অধিবাসীরা এখনো নিজেদের প্রাচীন ধর্মেরই অনুগামী। রাজার শাসন-দপ্তর এখানেই। এ শহরটিও ভারতীয় পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে গড়ে ওঠা। বাড়িঘর ও জনবসতিতে পূর্ণ। একটি বাজারও রয়েছে এখানে। প্রতিদিন বসে এটি। কানানোরের মতো এখানেও সব রকম পণ্যাদি এসে জমা হয়; বরং সেখানকার চেয়ে আরো বেশি পরিমাণে।

কোচিন একটি দ্বীপ। দ্বীপটির অধিকাংশ স্থানই ছোট ছোট নদীতে ঘেরা। দ্বীপের মধ্য দিয়েও নদী চলে গেছে। (বর্তমান কোচিনের সঙ্গে লিনসকেটেনের এই বর্ণনার অবশ্য কোন সাদৃশ্য নেই। এখন এটি আর দ্বীপ নয়)।

কোচিনের ঠিক বিপরীতে, উত্তর দিকে, আরেকটি দ্বীপ আছে। এটির নাম বাইপিন (Vaipin)। এটিও চারিদিক থেকে জলে ঘেরা। ঠিক ক্রাঙ্গানোর দুর্গের মতোই। এখানকার ভূ-ভাগ, সত্যি বলতে কি সমগ্র অঞ্চলটিই হল্যাণ্ডের মতো নীচু ও সমতল, তবে সেখানকার মতো খানাখন্দ নেই। সমুদ্র-উপকূল জুড়ে যেদিকে তাকাও শুধু সমতল আর সমতলভূমি। উপকূলের জলভাগ ও নদীমোহনার মধ্যে মাথা তোলা ভূ-ভাগও সমতল, তবে জলে ঘেরা। কোথাও কোন উঁচু ভূমি বা টিলার দেখা নেই। সারা দেশ ঘন সবুজে ঢাকা, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেদিক তাকাও গাছ আর গাছ, ঘন অরণ্য। দারুচিনি গাছের অরণ্যও রয়েছে। এগুলোকে বুনো দারুচিনি বলা হয়। সিংহলের দারুচিনির মতো এগুলি উৎকৃষ্ট মানের নয়। সিংহলের দারুচিনির দাম যখন ১০০ পরদাওয়ে বা ডলার, এর দাম তখন ২৫ থেকে ৩০ (এক কুইন্তার ?)। এ দারুচিনি পর্তুগালে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। তবুও প্রতি বছর এগুলি প্রচুর পরিমাণে নিয়ে যাওয়া হয়। আর, বাণিজ্য শুল্কের খাতায় নথিভুক্ত করা হয় সিংহলী দারুচিনি বলেই। ফলে, রাজাকে তারা এজন্য ভালো দারুচিনির জন্য দেয় করই দিয়ে থাকে।

কোচিনে প্রচুর গোলমরিচও মেলে। প্রতি বছর দু জাহাজ ক'রে জোগান দেবার ক্ষমতা রয়েছে। পর্তুগাল থেকে বয়ে-আনা পণ্যসামগ্রী গোয়ায় খালাস করার পর জাহাজগুলি এখান থেকে ও আগে নাম করা দুর্গগুলি থেকে এগুলি নিতে আসে।

মালাবারীদের সঙ্গে মিলে মিশে অনেক মুসলমানধর্মী মুর ও অনেক ইহুদী কোচিনের বহিরাঞ্চলে বাস করে। এই ইহুদীরা বিরাট ধনী। ধর্মমতের জন্য এখানে তাদের কোনরকম লাঞ্ছনা সইতে হয় না, সহজভাবে বসবাসের সুযোগ

পায়। মুসলমানদের বেলাও ঠিক তাই। তাদের গীর্জাও রয়েছে এখানে, তাকে তারা মসজিদ বলে। ব্রাহ্মণদেরও দেব-বিগ্রহ ও দেবালয় রয়েছে এখানে। তাকে তারা প্যাগোডা (মন্দির) বলে। এই তিন ধর্মাবলম্বীরাই এখানে তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজস্ব ধর্মীয় বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান, আনন্দ-উৎসবাদি পালন করে থাকে। পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলে।

রাজার পারিষদ সভায় নায়ার বা এখানকার ভদ্র ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ছাড়াও এই তিন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রয়েছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি দেখা দিলে তিন সম্প্রদায়ের লোকরা একস্থানে সমবেত হয়, রাজাও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাদের উপর বিশ্বাস রাখেন, নির্ভর করেন।

কোচিন থেকে বারো (ডাচ) মাইল পর কুইলন। এর অবস্থান নয় ডিগ্রীতে। এখানেও পর্তুগীজদের একটি দুর্গ আছে। প্রতি বছর এখানে এক জাহাজ গোলমরিচ সংগ্রহ করে থাকেন তারা।

কুইলন থেকে কুমারিকা অন্তরীপের দূরত্ব কুড়ি (ডাচ) মাইল। অন্তরীপটি ঠিক সাড়ে সাত ডিগ্রীতে অবস্থিত। এখানেই মালাবার উপকূল ও ভারত-সীমানার শেষ।

ছয়ঃ মালদ্বীপ ও সিংহল

কুমারিকা অন্তরীপের সোজাসুজি সাগর বুকে ৬০ (ডাচ) মাইল পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেলে যে দ্বীপপুঞ্জটির দেখা পাওয়া যাবে তারই নাম মালদ্বীপ। এই দ্বীপ-পুঞ্জের উত্তর সীমা সাত ডিগ্রীতে অবস্থিত। আর দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ-পূব ঘেঁষে তিন ডিগ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র অঞ্চল ১৪০ (ডাচ) মাইল দীর্ঘ।

অনেকে বলেন এখানে এগারো হাজার দ্বীপ রয়েছে। সঠিক সংখ্যা অবশ্য জানা নেই। তবে দ্বীপের সংখ্যা সত্যিই এতো বিরাট যে গুণে ঠিক করা সম্ভব নয়। এখানকার অধিবাসীরা দেখতে মালাবারীদের মতোই। সবগুলি দ্বীপে লোকবসতি নেই। কতক বেশ নীচু। অনেকটা কোচিন, ক্রাঙ্গানোর প্রভৃতির মতো। কতক দ্বীপ আবার এতো নীচু যে সাগর জলেই ডুবে থাকে।

মালাবারীরা বলে, এককালে নাকি এ অঞ্চল মালাবারের মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে সমুদ্রে ক্ষয়ে গিয়ে বর্তমান চেহারা নিয়েছে।

নারকেল আর নারকেলের ছোবড়া ছাড়া আর কোন পণ্য এখানে পাওয়া যায় না। ছোবড়াগুলি নারকেলেরই উপরকার খোলস। একে ভারতীয় খড় বলা যেতে পারে। এগুলি দিয়ে তারা দড়ি, কাছি ও এই জাতীয় নানা জিনিষ তৈরী করে। মালদ্বীপে এগুলি প্রচুর পরিমাণে মেলে। পরিমাণ এতো বেশি যে সারা ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য উপকূলের চাহিদা মেটায় তারা।

এই নারকেল গাছের কাঠ দিয়েই তারা স্বকীয় রীতিতে নৌকা বানায়। এজন্য তারা পুরোপুরি স্থানীয় জিনিসপত্রই ব্যবহার করে। পাল বানায় এই নারকেল গাছেরই পাতা দিয়ে। নৌকা গড়ে নারকেল দড়ি দিয়ে কাঠগুলোকে বেঁধে বেঁধে। কোথাও একটি পেরেকের ব্যবহার করে না। তারপর নারকেল আর নারকেল গাছের নানা অংশ সেই নৌকায় বোঝাই করে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে পড়ে। নৌকাযাত্রা কালে ওই নারকেলই তাদের খাদ্য। তার মানে নৌকা, তার আসবাব, পণ্য, খাদ্য, সবই নারকেল গাছ-জাত। সারা মালদ্বীপপুঞ্জের লোক এর উপরেই বাঁচে, এগুলিই তারা সারা ভারতে রপ্তানি করে।

এই দ্বীপপুঞ্জের কতক বিশেষ ধরনের নারকেলকে ভারতের সবার সেরা বলে বিচার করা হয়। এগুলি বিষক্রিয়ার ওষধি রূপে কাজ করে (এ ধারণা ভুল)।

এই নারকেলগুলি দেখতে বেশ সুন্দর, আকারেও বড়, রঙ কালো। এর কতক নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এগুলি ভারতের (পর্তুগীজ) শাসনকর্তাকে উপহার দেওয়া হয়। এক একটি নারকেল ভারতীয় দুই 'কানে' মাপের পাত্রের মতো বড় বড় আকারের। দাম ৩০০ পরদাওয়ের ওপর। এগুলি স্পেনের রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কুমারিকা অন্তরীপ থেকে উপকূলভাগ আবার বাঁক নিয়ে উত্তর-পূব অভিমুখী হয়ে ভিতরের দিকে চলে গেছে টানা নেগাপত্তম অন্তরীপ পর্যন্ত। এ জায়গাটির অবস্থান এগারো ডিগ্রীতে। কুমারিকা থেকে দূরত্ব ৬০ (ডাচ) মাইল।

কুমারিকা অন্তরীপ থেকে দক্ষিণ-পূব দিক ঘেঁষে দক্ষিণে সমুদ্রের প্রায় চল্লিশ মাইল ভিতরে বিরাট সিংহল দ্বীপের শেষ প্রান্ত ভাগ। সেখান থেকে পূবদিক বরাবর উত্তর দিক পানে এগোলে ঠিক নেগাপত্তম অন্তরীপের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। মূল (ভারত) ভূভাগ থেকে (সিংহলের) এ স্থানটির মধ্যবর্তী ব্যবধান দশ মাইল। মূল ভূভাগ ও এই দ্বীপের সাগর মাঝে কতক চর বা ক্ষুদে ক্ষুদে দ্বীপ আছে। যেসব জাহাজ করমণ্ডল উপকূল ও বাঙলায় যায়, তারা সাধারণতঃ এ পথ দিয়েই চলাচল করে। অনেক সময় এজন্য তাদের বেশ বিপদে পড়তে হয়।

সিংহল দ্বীপটি লম্বায় ৬০ (ডাচ) মাইল, চওড়ায় ৪০ (ডাচ) মাইল। উত্তর প্রান্তসীমা থেকে পূব দিকে আঠারো (ডাচ) মাইল দূরে সাড়ে সাত ডিগ্রীর কাছাকাছি পর্তুগীজদের একটি দুর্গ রয়েছে। এর নাম কলম্বো। এটিকে এক রকমের জবর দখল করে, বিস্তর অর্থব্যয় করে অধিকারে রাখা হয়েছে। কেননা, এছাড়া আর এক পা জায়গাও পর্তুগীজদের সেখানে নেই। দুর্গটি খুবই ছোটখাটো। তবে বেশ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত। যেসব লোক কোন না কোন অপরাধের জন্য নির্বাসিত হয়েছে বা মৃত্যুদণ্ড পাবার মতো কোন কুকাজ করেছে তাদের নিয়েই সাধারণতঃ এখানকার সৈন্যদল গড়া হয়েছে। কুকাজের জন্য দাগী কতক অসৎ স্ত্রীলোককে এদের সঙ্গ দেবার জন্য রাখা হয়েছে এখানে। তারা এদের যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভারত থেকে সংগ্রহ করে। দ্বীপের অধিবাসীরা এদের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন। প্রায়ই তাদের দ্বারা এরা আক্রান্ত হয়ে থাকে। তারা বহু বার এ দুর্গটিকে অবরোধ করেছে। তবে প্রত্যেক বারই পরাক্রমের সঙ্গে তা প্রতিরোধ করা হয়েছে।

সাত ঃ করমণ্ডল উপকূল ও সন্ত থমাস শহর

"নেগাপত্তম অন্তরীপ থেকে করমণ্ডল উপকূলের শুরু। উত্তরমুখী হয়ে ক্রমশঃ পূবে এগিয়ে মুসলিপত্তনে এর শেষ হয়েছে। পুরো উপকূল ৯০ (ডাচ) মাইল দীর্ঘ। মুসলিপত্তনের অবস্থান সাড়ে ষোল ডিগ্রীতে। এ দুয়ের মাঝে সাগর তটে সন্ত থমাস নামে একটি স্থান রয়েছে। এর অবস্থান সাড়ে তের ডিগ্রীতে, নেগাপত্তম থেকে ৪০ (ডাচ) মাইল দূরে।

"নেগাপত্তম ও সন্ত থমাস দুটি এলাকাতেই পর্তুগীজদের বসবাস রয়েছে। এছাড়া উপকূল জুড়ে সব অঞ্চলেই জাহাজ চলাচল ও ব্যবসা আছে তাদের। সন্ত থমাস শহরটি অতীতে একটি বড় বন্দর ও ব্যবসাঘাঁটি ছিল। তখন একে বলা হতো মেলিয়া পুর (মালে পুর)।"

সন্ত থমাস সম্পর্কে লিনসকোটেনের এই উক্তি সত্য নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে মারকো পোলো ও পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (আঃ ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে) কন্টি এর বর্ণনা করে গেছেন। দুজনের সময়েই এটি একটি নগণ্য শহর ছিল।

"নরসিংহ রাজ্যের অধীনে ছিল এ শহরটি। এর রাজা বর্তমানে বিশনগরের রাজা রূপে সাধারণের কাছে পরিচিত। বিশনগর তার রাজ্যের প্রধান শহর। এখানেই তার রাজধানী। এ শহরটি ভিতরের দিকে। পুরো করমণ্ডল উপকূল মধ্যে এটিই প্রধান শহর। এ এলাকার মূল অধিবাসীরা আচার-ব্যবহার, রীতি-প্রথা, উৎসব-অনুষ্ঠানাদির দিক থেকে বল্লগণ্ডি (বালাঘাটি ?), দক্ষিণী ও কানাড়ী-দের মতোই। এরা সকলে প্রকৃতপক্ষে একই জাতির লোক। স্থানভেদ, রাজ্য ভেদের জন্যই শুধু যা এরকম পৃথক পৃথক নাম।"

নরসিংহ রাজ্য প্রকৃতপক্ষে বিজয়নগর। পর্তুগীজরা যখন এ অঞ্চলে আসে তখন বিজয়নগরের রাজা ছিলেন নরসিংহ (১৪৯০-১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দ)। তারা 'নরসিংহ'কেই রাজধানী ও রাজ্যের নাম বলে ভুল করেন। সেই থেকেই এ ভুল চলে এসেছে। বিশনগর বিজয়নগরেরই বিকৃত রূপ।

"এ স্থানটির নাম কেন সন্ত থমাস হলো এর উত্তরে ভারতীয়রা যা বলে থাকেন তা এই রকম। খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্য যখন পৃথিবীময় তার বানী প্রচারের জন্য বেরিয়ে পড়েন তখন তাদের একজন, সন্ত থমাস, এই নরসিংহ রাজ্যে আসেন।

আসার পথে তিনি বিভিন্ন ভারতীয় অঞ্চলে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেন। ওই সব ভারতীয় ও অন্য ধর্মীরা এ থেকে অবশ্য খুব অল্পই উপকৃত হন। স্থানীয় খ্রীষ্টানরা অন্ততঃ এ রকম কথাই বলে থাকেন।

"পর্তুগীজরা যখন এদেশে আসেন তখনও সন্ত থমাসের দীক্ষিত খ্রীষ্টানদের বংশধরদের মধ্যে অনেকেই এ ধর্মমত অনুসরণ করে চলেছিলেন। তবে সকলেই তারা চালডিয়ান ভাষায় গ্রীক চার্চের রীতি অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। পর্তুগীজ অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতে তাদের একটুও আগ্রহ ছিল না। আমি এখানে আসার অল্পকাল পূর্বে এদের একজন বিশপ স্থলপথে রোমে যান ও রোমান চার্চের আনুগত্য স্বীকার করেন। তবুও তারা প্রাচীন বিধি প্রথাই অনুসরণ করে চলতে থাকেন। পোপ তাদের সেরকম অনুমতিও দেন।

'আমার কর্তা আর্ক-বিশপ যখন গোয়ায় প্রাদেশিক উপদেষ্টা পর্ষদের সম্মেলন ডাকেন তখন তার অধীন বিশপেরা সকলে সেখানে সমবেত হন। কোচিন, মালাক্কা, চীন সব অঞ্চলের। এসময় ওই বিশপও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি সবে তখন রোম থেকে ফিরেছেন ও আর্ক-বিশপ হয়েছেন। সম্মেলনে উপস্থিত হলেন তিনি। কিন্তু সন্ত থমাস খ্রীষ্টান নামে পরিচিত আপন গোষ্ঠির কোন রকম ধর্মীয় রীতি-নীতির কিছু মাত্র পরিবর্তন করতে তাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না।

"যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি আবার। নরসিংহে সন্ত থমাস দীর্ঘ দিন ধরে বাণী প্রচার করে চললেও তাতে সাড়া পাচ্ছিলেন না কোনরকম। কেননা, অলীক ও শয়তান সুলভ আকৃতির বিগ্রহ সমন্বিত দেবমন্দিরগুলির পরিচালক ব্রাহ্মণেরা তাকে সবরকম ভাবে বাধা দিয়ে ও হয়রান করে চলছিলেন। সন্ত থমাস রাজার কাছে একখণ্ড জমি চাইলেন উপাসনা গৃহ নির্মাণের জন্য। ব্রাহ্মণ ও তুকতাককারীদের প্ররোচনায় তাও দেয়া হলো না তাকে। কেননা, সকলেই তারা ওই ধর্মের অনুগামী ছিলেন। কিন্তু ভগবানে অপার মহিমায় মেলিয়াপুর পোতাশ্রয়ের মুখে একদিন একটা গাছ পড়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিল। জাহাজ ও নৌকা চলাচলের আর কোন উপায় রইলো না। ফলে বন্দরের দৈনিক রাজস্ব আদায় কমে গেল, রাজার প্রচুর ক্ষতি হতে থাকলো। বাধ্য হয়ে রাজা তিনশো হাতি জড়ো করে ওই গাছটিকে তুলে ফেলার আয়োজন করলেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। গাছটিকে এতো করেও এক পা সরানো গেলো না। রাজা ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। ব্রাহ্মণ ও গণৎকারেরা সমস্যা সমাধানের কোন পথ দেখাতে পারলো না তাকে। তখন তিনি ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি

কোন রকম কৌশল করে এ গাছটিকে সরিয়ে দিতে পারবেন তাকে তিনি প্রচুর পুরস্কার দেবেন। তখন সন্ত থমাস রাজার কাছে গিয়ে বললেন, তিনি একাই গাছটিকে সরিয়ে দেবেন। এজন্য কোন পুরস্কার চান না তিনি। শুধু ওই গাছের কাঠ দিয়ে তাকে তার উপাসনা গৃহ তৈরী করতে দেওয়া হোক। সন্তের কথায় রাজা ও তার ব্রাহ্মণেরা কৌতুক বোধ করলেন। মজা দেখার জন্যই তারা সন্তের কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

"সন্ত থমাস এবার সকলের চোখের সামনে তার কোমরবন্ধনীটি খুলে ফেললেন। সেটি দিয়ে গাছটিকে বেঁধে একা একাই তাকে অবলীলাক্রমে ডাঙায় টেনে তুললেন। এ দৃশ্য দেখে চারিদিকে চমক খেলে গেলো। অনেকেই এবার তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে খ্রীষ্টান হলেন।

"ব্রাহ্মণ আর তাদের দেবতাদের প্রতি অনেকেরই ভক্তি ছুটে গেলো এই ঘটনার পর থেকে। ফলে ব্রাহ্মণরা সন্ত থমাসের ঘোর বিরূপ হলেন। নানাভাবে ফন্দী এঁটে চললেন তাকে মেরে ফেলার জন্য। শেষ পর্যন্ত সফলও হলেন। স্থানীয় একজন অধিবাসীকে এজন্য তারা প্ররোচিত করে তুললেন। একদিন সন্ত যখন হাঁটু গেড়ে তার উপাসনা গৃহে আরাধনায় রত এমন সময় সে লোকটি পিছন থেকে আচমকা তাকে আঘাত করলো।

"এ সম্পর্কে যে ইতিহাস এখন পর্যন্ত জানা গেছে তার চিত্র এঁকে গীর্জাগুলিতে ও অন্যান্য বহুস্থানে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।

"তারা আরো বলেন, যে সম্প্রদায়ের লোক সন্তকে হত্যা করেন তাদের বংশধরদের প্রতি ঈশ্বরের কোপদৃষ্টি পড়েছে। রোগাক্রান্ত করে দিয়েছেন তাদের তিনি। সকলেই তারা গোদরা পা নিয়ে জন্মায়। এরকম রোগাক্রান্ত অনেক নারী ও পুরুষ দেখেছি আমি। সন্ত থমাসের কাছেপিঠে এদের অনেক গ্রাম আছে, আত্মীয়-স্বজনদের বসতি রয়েছে। এদের অনেকে আবার খ্রীষ্টানও। রোগের ফলে তাদের পায়ের এ দশা হয়েছে কি অন্য কোন কারণে, তা শুধু ভগবানই বলতে পারেন। তাদের অনেকের সঙ্গেই আমি কথা বলেছি, এর কারণও জিজ্ঞাসা করেছি। তারা বলে, এর সঠিক কারণ তারা জানে না, শুধু যা লোকমুখে শুনতে পায়, সন্তকে হত্যার পাপেই নাকি এমনটি হয়েছে। তবে, এজন্য কিন্তু তাদের চলাফেরায় কোন অসুবিধে হয় না, গতি একটুও মন্থর হয় না। শুধু যা পায়েরই কদাকার চেহারা।"

এখানে, লিনসকোটেন সন্ত থমাস-এর যে আখ্যায়িকা শুনিয়েছেন তা যে

পরবর্তীকালীন কপোলকল্পনা তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। এখানে সবচেয়ে হাস্যকর হলো সন্ত থমাসের সময় নরসিংহ বা বিজয়নগর রাজ্যের অস্তিত্ব। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে মারকো পোলো যে আখ্যায়িকা শুনিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই আখ্যায়িকা তার পরবর্তী কোন সময়ে চালু হয়েছিল। খুব সম্ভবতঃ পর্তুগীজরা এখানে বসতি স্থাপনা করার পরই সন্ত থমাসের মহিমা বৃদ্ধির জন্য এটি চালু করা হয়েছিল। মারকো পোলো যে আখ্যায়িকা আমাদের শুনিয়েছেন তাতেও বলা হয়েছে যে সন্ত অপরের হাতে নিহত হয়েছিলেন, কিন্তু সে হত্যা ইচ্ছাকৃত ছিল না, সম্পূর্ণ আকস্মিক দুর্ঘটনা।

"কালক্রমে মেলিয়াপুর শহরটির আগের গৌরব অস্তাচলে গেছে, সে দরিদ্র হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরন্তন নয়, অবিনশ্বর নয়। সবই মায়াবৎ, ধূম্রবৎ। যাই হোক, পর্তুগীজরা এটিকে আবিষ্কার করার পর আবার এখানে জাহাজ চলাচল শুরু হলো। একটি ছোট শহর গড়ে উঠলো। যেখানে সন্ত-র সমাধি ও কাঠের উপাসনা গৃহ ছিল সেখানে একটি পাথরের গীর্জা তোলা হলো। তার অলৌকিক কীর্তির স্মারক হিসাবে ওই কাঠ দিয়েই গীর্জাটির দরজা তৈরী করা হয়েছে। সেখানে সন্তের অস্থিও রক্ষিত আছে। সেই পবিত্র স্মারককে প্রগাঢ় সম্মান দেখান হয়। অনেকেই অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে এখানে তীর্থ করতে আসেন। সে ভিড় দিন দিন বেড়েই চলেছে।

"চার্চের দরজাগুলি সেই কাঠ দিয়ে তৈরী হবার দরুন সকলেই তা থেকে কেটে নিয়ে যায়। সোনা বা রূপা দিয়ে বাঁধিয়ে অনেকেই তাকে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন পবিত্র স্মারক হিসাবে। চলতি মতে এর অনেক অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এমনিভাবে কাঠ কেটে নেয়া রোধ করার জন্য স্থানীয়রা চার্চের দরজাগুলিতে অসংখ্য কাঁটা গেঁথে দিয়েছে। ফ্লানডার্সের ব্রুস শহরের এ. ফ্লেমিং তিরিশ বছরের উপর এ শহরে আছেন। এখানেই বিয়ে থা করেছেন। সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফ্লেমিং আমাকে বিশেষ উপহার রূপে এই কাঠ দিয়ে তৈরী একছড়া গুটির মালা পাঠিয়েছেন। এটি তিনি অনেককাল আগে তৈরী করিয়েছিলেন। একজন পর্তুগীজ মহিলা এটি গোয়ায় আমার কাছে বয়ে নিয়ে আসেন। এর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। আমাকে জানালেন এই মালাটি তাকে বিরাট ঝড়-তুফান ও বিপদের কবল থেকে বাঁচিয়েছে পথে। তুফানের মুখে পড়ে যেই তিনি মালাটি সাগরের বুকে ছুঁইয়েছেন অমনি সে শান্ত হয়ে গেল। একে তিনি জগতের সেরা পবিত্র বস্তু রূপে স্তুতি করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

মুসলিপত্তম থেকে উপকূলভাগ আবার উত্তর-পূবমুখী হয়েছে ও পূবদিকে টানা এগিয়ে গেছে বাঙলা পর্যন্ত। এ অঞ্চলের দৈর্ঘ্য ১২০ (ডাচ) মাইল। ওড়িশা রাজ্য এই উপকূল বরাবর গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর গঙ্গা নদী থেকে বাঙলার সীমানা শুরু। নরসিংহ, বিশনগর, (দুই-ই প্রকৃতপক্ষে এক) ও ওড়িশার উপকূলকে পর্তুগীজরা সাধারণত করমণ্ডল উপকূল বলে থাকেন। এর-পর বাঙলার উপকূল। এখানে পর্তুগীজদের বিরাট ব্যবসা ও জাহাজ চলাচল রয়েছে। এটি একটি অতি সম্পদশালী, সবরকম প্রাচুর্যে ভরা দেশ। চাল, সবরকমের পশু-পাখি অজস্র পরিমাণে রয়েছে। দেশটি বেশ স্বাস্থ্যকরও। নতুন জাতির লোকদের পক্ষে এখানকার জলবায়ু বেশ ভালো। এজন্য পর্তুগীজ ও অন্যান্য দেশীয়রা এখানে ভারতের তুলনায় ভালোভাবে জলপথে চলাচল করতে পারে। এই উপকূল থেকে তারা অসংখ্য জাহাজ নিয়ে বাঙলা, পেগু, শ্যাম, মালাক্কা ও ভারতে (কঙ্কন ও মালাবার উপকূল) যায়।

নেগাপত্তম, সন্ত থমাস ও মুসলিপত্তমে অতি উৎকৃষ্ট ধরনের সুতীবস্ত্র বোনা হয়। সব রকম রঙেই এগুলি পাওয়া যায়। নানাপ্রকার ফুল ও মূর্তির নক্সা থাকে সেগুলিতে। অতি চমৎকারভাবে ও নিপুণতার সঙ্গে সেগুলি ফোটান হয়। ভারতবর্ষে এই বস্তুই সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কদর রেশমের চেয়েও বেশি। সূক্ষ্মতা ও শিল্পকর্মের নিপুণতার জন্য রেশমের চেয়েও এর খ্যাতি। এগুলির নাম রেচতা ও চিন্তজে। খ্রীষ্টান ও পর্তুগীজরা এগুলি দিয়ে ব্রীচেস তৈরী করে। স্থানীয় লোকেরা এদিয়ে মেয়েদের কাপড় (শাড়ী) বানায়। এর এক প্রান্ত তারা নাভির নিচে বেড় দিয়ে পরে ও অন্য প্রান্ত দিয়ে ঊর্ধ্বশরীর ঘিরে দেয়। এগুলি সাধারণতঃ তারা বাড়িতেই ব্যবহার করে। এ কাপড়গুলিকে অতি মিহি করে বোনা হয় এবং সেরা মানের কাপড়গুলিকে তারা সরেস কাপড় বলে উল্লেখ করে থাকে। কতক কাপড় বোনার সময় তাতে সোনা ও রূপার সুতা মিশিয়ে নেয়। হাজারো প্রকারের কাপড় বুনোট হয় এ অঞ্চলে। সেগুলি দেখতে সত্যিই অপূর্ব। আর সেগুলিকে তারা বেশ ভদ্রভাবে পরে।

এই উপকূলে অতি লম্বা ও মোটা একপ্রকার নলগাছ (বাঁশ) জন্মে। ভারতীয়রা এদিয়ে পালকী তৈরী করে। মেয়েদের বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এর ব্যবহার করা হয়। দেখতে এগুলি বেশ সুন্দর, লম্বা এবংমোটাও খুব। অনেক রকম রঙের হয় এগুলো—কালো, লাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

আট ঃ বাঙলা

ওড়িশা রাজ্য ও করমণ্ডল উপকূল শেষ হবার পর শুরু হয়েছে বাঙলা রাজ্যের গঙ্গা নদী। পৃথিবীর খ্যাতনাম্না নদীগুলির মধ্যে এটি একটি। এর উৎসস্থল জানা নেই। কতক লোক বলে থাকেন যে এটি ভূ-স্বর্গ থেকে জাত হয়েছে। বাঙালীদের মধ্যে এরকম একটি পুরোনো প্রবাদ চালু রয়েছে: বাঙলার এক রাজা জানতে উৎসুক হলেন এ নদীটি কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তার অনুসন্ধানে পাঠাবার জন্য কতক লোককে তিনি বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তুললেন। এজন্য তাদের কাঁচা মাছ খাওয়া ইত্যাদি ধরনের সব অভ্যাস করানো হলো, যাতে তারা যে কোন পরিস্থিতি ও পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে। তারপর নৌকায় করে তাদের সেই অনুসন্ধান অভিযানে পাঠানো হলো। মাস কয়েক নদীপথে এগিয়ে চলার পর সুমিষ্ট গন্ধে ভরপুর একটি স্থানে এসে তারা উপনীত হলেন। সেখানকার আকাশ অতি পরিষ্কার, স্নিগ্ধ রৌদ্রকরোজ্জ্বল। নদীজল ধীর স্থির উপাদেয়। স্থানটি দেখে তাদের মনে হলো এ যেন এক স্বর্গ। আরো এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন তারা, কিন্তু পারলেন না। তাই সেখান থেকেই দেশে ফিরে এলেন। রাজাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। এ বিবরণ বিশ্বাস করা অবশ্যই কঠিন সুতরাং পুরোটা পাঠকদের বিচারবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দিলাম।

মিশরের নীল নদের মতো এই নদীটিতেও কুমীর রয়েছে। নদীটির মোহনা বাইশ ডিগ্রীতে অবস্থিত। উপকূল এখান থেকে পূবদিকে এগিয়ে গেছে দক্ষিণের পথ ধরে একেবারে আরাকান রাজ্যে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ (ডাচ) মাইল। এই উপকূলভাগ অসমান এবং দ্বীপ, চড়া, বাঁক ও খাড়িতে ভরপুর। এর কারণ আর কিছুই না। পুরো বাঙলা ভূ-ভাগ এক উপসাগর কূলে অবস্থিত। উপসাগরটির নাম বাঙলা উপসাগর। তারপর আরাকান থেকে এই উপসাগর দক্ষিণ-মুখী হয়ে পূবদিকে চলে গেছে মালাক্কা ও সিঙ্গাপুরের দিকে।

আবার বাঙলা ও গঙ্গা নদীর কথায় ফিরে আসি। এই নদীকে ভারতীয়রা পবিত্র ও পুণ্যতোয়া বলে মনে করে। তাদের বদ্ধমূল ধারণা, এ নদীতে স্নান করলে সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়, নতুন জন্মের ন্যায় দেহ ও মন পবিত্র হয়। এ জলে যিনি স্নান করেননি তার কখনো মুক্তি নেই। ফলে, ভারত ও পূবদেশের বিভিন্ন

অঞ্চল থেকে অসংখ্য পুণ্যলোভাতুর সেখানে স্নান করতে আসে। নানারকম বিচিত্র ধরনের সব অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ করে থাকে যার বর্ণনা শুনতেও গায়ে কাঁটা দেবে। তাদের মনে অন্ধ বিশ্বাস যে এর ফলে তারা চির অমৃতময় জীবন লাভ করবে।

এই নদী থেকে পূবদিকে পঞ্চাশ (ডাচ) মাইল গেলে ছাতি গাঁ (চাট গাঁ—চট্টগ্রাম)। বাঙলার মূল অধিবাসীরা আচার ব্যবহারের দিক থেকে সিংহলীদের মতো। তবে গায়ের রঙ সিংহলীদের তুলনায় ফরসা। তারা অতি কূট ও দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন লোক। সমগ্র ভারতবাসীদের মধ্যে বাঙালী ক্রীতদাসরাই সব থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয়। কেননা এরা সকলেই চোর স্বভাবের। মেয়ে মাত্রেই গণিকা। অবশ্য, এই চারিত্রিক ত্রুটি সারা ভারত জুড়েই দেখা যায়, কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই।

এদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা দেখা যায়। কখনো এরা একই (মাটির) পাত্রে বার বার রান্না করে না, প্রত্যেকবার নতুন পাত্র ব্যবহার করে। কোন রকম ব্যভিচার করলে (মেয়েদের) নাক কেটে দেয়া হয়। এরপর সে আর (স্বামীর সঙ্গে) একত্রে বসবাস করতে পারে না। এদের সামাজিক বিধি-নিয়মে এ ধরনের কাজকে অতি ঘৃণার চোখে দেখা হয়।

পূর্ব অনুচ্ছেদে বাঙালীদের চরিত্র সম্পর্কে লিনসকোটেন যে মন্তব্য করেছেন তা স্পষ্টই পরবর্তী অনুচ্ছেদের বক্তব্যের বিরোধী। এথেকে মনে হয়, বোধ হয় তিনি বাঙালী ক্রীতদাস-দাসীদের সম্পর্কে এই উক্তি করেছেন। নয়তো বলতে হবে, নেহাৎ শোনা কথাকেই যাচাই-বিচার না করে বিবরণে স্থান দিয়েছেন।

পুরো দেশটি জুড়ে সবরকম খাদ্যপদার্থের অসীম প্রাচুর্য্য রয়েছে। বিশেষ করে চালের। সমগ্র প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে চালের ফলন এখানেই সব থেকে বেশি। প্রত্যেক বছর অসংখ্য জাহাজ বোঝাই চাল এখান থেকে তারা রপ্তানি করে। সব দেশ থেকেই এসব জাহাজ আসে। বছরের কোন সময়েই এখানে চালের ঘাটতি দেখা যায় না। অন্যান্য সব জিনিষেরও ঘাটতি নেই। আর এসব জিনিষ এতো শস্তা যে বলার মতো নয়। একটা ষাঁড় কিংবা গরু মাত্র এক লারি, বা মাত্র আধ গিলডারনের সমান। ভেড়া, মুরগি প্রভৃতিরও ওই অনুপাতে দাম। এক কাণ্ডি (কাঠি) চাল, যা ফ্লেমিশ মাপের ১৪ বুশেলের সামান্য কম-বেশি, মাত্র আধ গিলডারনে বা আধ ডলারে বিক্রী হয়।

চিনি ও অন্যান্য জিনিষপত্রের দামও ওই রকম। এথেকে সহজেই আপনি

অনুমান করতে পারবেন যে এদেশে জিনিষপত্রের কিরূপ প্রাচুর্য্য। পর্তুগীজরা এখানে ব্যবসাবাণিজ্য করে, জাহাজ নিয়ে চলাচল করে। কয়েকস্থানে তাদের বসতিও রয়েছে। এ অঞ্চলের বন্দর (দুটিকে) তারা Porto Grande বা বড় বন্দর ও Porto Pequene বা ছোট বন্দর নামে উল্লেখ করে থাকেন। তবে এখানে তাদের কোন দুর্গ নেই। কোন সরকার বা পুলিশ বাহিনীও নেই, যেমনটি ভারতে তাদের রয়েছে। এখানে তারা অনেকটা বুনো জন্তু বা পোষ না মানা ঘোড়ার মতো বাস করে। প্রত্যেকেই যে-যার মন-ইচ্ছা কাজ করে, প্রত্যেকেই যেন এক একজন ভগবান। ন্যায় বিচারের ধারও মাড়ায় না কেউ। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই রীতিতেই বসবাস করে চলেছে তারা। এদের অধিকাংশই এমন কোন না কোন কুকাজ করেছে যে জন্য তারা ভারতে (অর্থাৎ পশ্চিম উপকূলে) বসবাস করতে সাহস পায় না। এসব সত্ত্বেও বিভিন্ন জাহাজ ও বণিকেরা পণ্য নেবার জন্য প্রচুর সংখ্যায় এখানে যাতায়াত করে। প্রাচ্যের সব দেশ থেকে, আর বছরের সব সময়ে।

চাল ছাড়া প্রচুর পরিমাণে সূতীবস্ত্রও উৎপাদিত হয় এখানে। এগুলি অতি মিহি ধরনের। ভারতে এর প্রচুর কদর রয়েছে। শুধু যে ভারত ও প্রাচ্যের দেশগুলিতে এগুলি রপ্তানী হয় তা নয়। পর্তুগাল এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও যায়। এই সূতীবস্ত্র বহু প্রকারের। সরমপুর, কস্সা, কংসা, বিতিল্লিয়া (—অতি মিহি), শতপাস্সা এমনি হাজার রকমের সব নাম তার।

আরো এক রকমের উদ্ভিদ দিয়ে তারা এক ধরনের বস্ত্র তৈরী করে। ঠিক তুলার মতোই এই উদ্ভিদ দিয়ে তারা সুতা পাকায়। অনেকটা হলদে ঘেঁষা রঙ। একে বাঙলাই উদ্ভিদ বলা হয়। আমাদের মেয়েরা সন্তান প্রসব কালে যেমনটি করে থাকে তেমনি এরা সন্তানের নামকরণ কালে এই কাপড় দিয়ে তার শয্যা আবরণী, চাঁদোয়া, বালিশ, গালিচা, ঢিলা জামা প্রভৃতি বানায়; এগুলির উপর নানারকম ফুল-লতাপাতা-মূর্তির কাজ করে। এসব কাজ এতো সুন্দর আর এতো নৈপুণ্যের সঙ্গে করা যে ওর চেয়ে ভালো জিনিষ সারা য়ুরোপেও করা সম্ভবপর নয়। পুরো এই সুতো দিয়ে যেমন তারা কাপড় বোনে, তেমনি এগুলির সঙ্গে রেশম মিশিয়েও তা দিয়ে বোনে। তবে নির্ভেজাল এই সুতোর তৈরী কাপড়ের দাম ও কদর দুই-ই বেশি এবং রেশমের চেয়েও দেখতে সুন্দর। এসব কাপড়কে শাড়ী বলা হয়। ব্রীচেস তৈরীর জন্যও এ কাপড়ের ব্যবহার রয়েছে। ডাবলেট তৈরীর জন্যও। এগুলি

সুতীর কাপড়ের মতোই পরিষ্কার করা যায়। কাচার পর একেবারে নতুনের মতোই দেখায়।

গন্ধ-গোকুলের শরীরজাত গন্ধদ্রব্যও বাঙলা থেকে প্রচুর পরিমাণে আনা হয়। কিন্তু কূট চালাকী ও শয়তানীতে অভ্যস্ত বাঙালীরা নকল জিনিষ তৈরী ক'রে চালায়। নুন, তেল ইত্যাদি নানারকম নিকৃষ্ট পদার্থ ভেজাল মেশায় এতে। ফলে এ জিনিষের তেমন আর কদর নেই।

ল্যাটিনে যাকে রাইনোসোরেট ও পর্তুগীজ ভাষায় অ্যাবাদা বলে সেই জন্তুটিও (গণ্ডার) বাঙলায় বিস্তর পাওয়া যায়। এর শিঙ (খড়্গ), দাঁত, মাংস, রক্ত, নখর ইত্যাদি সব কিছুই বিষ-প্রতিষেধক হিসাবে অতি মূল্যবান। এজন্য সারা ভারতে এর খুব কদর রয়েছে।

মার্বেল পাথর রঙা একপ্রকার নলও এখানে জন্মায়। এর নানারকম প্রজাতি রয়েছে। পর্তুগীজরা এগুলিকে বাঙলাই বেত নাম দিয়েছে। এগুলি সাধারণ নলের মতো ফাঁপা নয়, পুরো নিরেট। স্পেনদেশীয় নলের মতো বা তার কাছাকাছি মোটা। এর বাইরের দিককার রঙ বিভিন্ন রকমের, দেখলে মনে হবে, বুঝি রঙ ছিটিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। পর্তুগালে বৃদ্ধারা এর লাঠি ব্যবহার ক'রে থাকেন। আরো এক জাতের নল রয়েছে যাকে এরা রোটা (রতন বেত) বলে। ঝুড়ি বোনার উইলো শাখার মতোই এগুলি সরু। ভারতে অনেক সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি বোনা হয় এগুলি দিয়ে। বোনা হয় আরো হাজারো রকম জিনিষ।

চিনি, ঘি এবং এ জাতীয় সব পদার্থও যে এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, আগেই তা বলেছি।

নয়ঃ গোয়া, সলসেত্তি ও বরদেজ দ্বীপ

ভারত এবং সারা প্রাচ্য দুনিয়ার পর্তুগীজ বসতিগুলির রাজধানী ও প্রধান শহর হলো গোয়া (মূল নাম গোভা)। এখানে পর্তুগীজদের বাণিজ্য পোত-বন্দর রয়েছে। শাসনকর্তা, আর্ক-বিশপ, রাজার মন্ত্রণা পরিষদের সভ্যগণ এখানেই থাকেন। কোষাগারও এখানে। ভারতে প্রধানভাবে যে সব শিল্প ও পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় এখানে সে সবের সংগ্রহ ব্যবস্থাও রয়েছে। কেনা-বেচার জন্য সব দেশের, সব জাতির বণিকেরা যাওয়া আসা করে। অ্যারাবীয়া, আরমেনিয়া, পারস্য, কাম্বে, বাঙলা, পেগু, শ্যাম, মালাক্কা, জাভা, মোলুক্কা, চীন প্রভৃতি সব দেশ থেকেই।

গোয়া দ্বীপ ও শহরের অবস্থান পনেরো ডিগ্রীতে। উত্তর দিকে। নিরক্ষবৃত্ত বা বিষুবরেখা থেকে চারশো (ডাচ) মাইল দূরে। একটি নদী দিয়ে দ্বীপটি ঘেরা এবং তিন (ডাচ) মাইলের উপর লম্বা। মূল ভূখণ্ডেরই লাগোয়া এটি। এতো লাগোয়া যে ভারতের সাগর উপকূল ও দ্বীপটির সাগর উপকূল একই রেখায় অবস্থিত। কেবল যা সাগরের একটি শাখা বা একটি নদী মূল ভূ-ভাগ থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই নদীটি শহরের উত্তর দিক দিয়ে পুরো দ্বীপটিকে অর্ধ-চন্দ্রের আকারে বেড় দিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে আবার গিয়ে সাগরে পড়েছে। নদী-টির একটি শাখা শহরের মধ্যেও বয়ে গেছে এবং চওড়ায় সেটি মোটামুটি মন্দ নয়। মূল ভূ-ভাগ ও দ্বীপটির মাঝে কতক ক্ষুদে ক্ষুদে দ্বীপ আছে। এগুলিতে এদেশের মূল বাসিন্দারা বসবাস করে। শহরের অন্যদিকে নদীটি স্থানে স্থানে এতো সংকীর্ণ ও অগভীর যে গ্রীষ্মকালে মোটে হাঁটুজল থাকে, হেঁটে পার হতে পারে লোকে। এ দিকটিতে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সহ একটি প্রাকার রয়েছে। মূল ভূ-ভাগ থেকে কোন রকম আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করার জন্য পরবর্তীকালে এটি তৈরী করা হয়েছে। এ ধরনের আক্রমণ প্রায়ই ঘটে। দিয়ালকান বা হিদালকান (আদিল খান) বিভিন্ন সময়ে একে অবরোধ করছে নদীর প্রবেশ মুখের কাছে।

গোয়া দ্বীপটির উত্তর দিকে বরদেজ দ্বীপটি অবস্থিত। বেশ উঁচু অঞ্চল এটি। এখানে পর্তুগীজরা নিরাপদে জাহাজ নোঙর করে। পণ্য বোঝাই ও খালাসের জন্যও একটি জায়গা আছে এখানে। এ দ্বীপটি পর্তুগীজদের অধীন। দ্বীপটি জুড়ে অসংখ্য গ্রাম, অধিবাসীরা সকলেই স্থানীয় লোক, কানাড়ী। এদের প্রায়

সকলেই খ্রীষ্টান। তবে পরনের পোষাক পরিচ্ছদ এদেশীয়দের মতোই। গোপনাঙ্গ ঢাকার জন্যে কোমরে শুধু যা একখণ্ড কাপড় জড়ানো। এ অঞ্চলটি নারকেল গাছে ভর্তি। নদীর মাঝে থাকা অন্য দ্বীপগুলিও তাই। একটি ক্ষুদে নদী এটিকে মূল ভূ-ভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নদীটি এতো ছোট যে মূল ভূ-ভাগ থেকে সহজে নজরে পড়ে না।

গোয়া দ্বীপের দক্ষিণদিকে নদীটি যেখানে সাগরে পড়েছে সেখানেও আর একটি অঞ্চলকে মূল ভূভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এ জায়গাটির নাম সলসেত্তি। এটিও পর্তুগীজদের অধীন। লোকবসতি রয়েছে। গাছপালা, ক্ষেত-খামারও বর্তমান। ঠিক একেবারে বরদেজের মতোই সব।

সলসেত্তি আর গোয়াদ্বীপের মাঝেও কতক ক্ষুদে ক্ষুদে দ্বীপ রয়েছে। এগুলিও নারকেল গাছে ভরাট। নদী মোহনার ঠিক মুখেই আরো একটি দ্বীপ আছে। নাম তার গোয়া বেলহ, অর্থাৎ পুরানো গোয়া। এখানে কোন কিছুর তেমন ফলন হয় না, লোকজনের বসতিও বিশেষ নেই।

পর্তুগালের রাজা বরদেজ ও সলসেত্তির জমি আবাদের জন্য বন্দোবস্ত দিয়ে থাকেন। তার রাজস্ব থেকেই আর্ক-বিশপ, মঠের সন্ন্যাসীদের, পুরোহিতদের, শাসনকর্তার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের বার্ষিক ভাতা দেয়া হয়। গোয়া দ্বীপটি ঘন পাহাড়ী এলাকা। এক এক স্থান এতো রুক্ষ ও অরণ্যসংকুল যে সেসব দিক দিয়ে শহর থেকে নদী বা সাগর কূলে যাওয়া মোটেই সহজসাধ্য নয়। এ দ্বীপ, এমনকি এর সাগর উপকূলও অনেক গ্রামে ভর্তি। কানাড়ীজনেরা থাকে সেখানে। তারাই এ দ্বীপের মূল অধিবাসী। কৃষিকর্ম ও নারকেল গাছই তাদের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন। এজন্য উপকূল ও হ্রদের গা ঘেঁষে বসবাস করে তারা। নারকেল গাছ উপকূলের কাছে বালি ভরা নিচু অঞ্চল ছাড়া জন্মায় না। ভূ-ভাগের উঁচু অঞ্চলে এ জন্যেই বিশেষ নারকেল গাছ নেই।

শহরের পূবদিকে, নদীর মাঝে, শহর থেকে তিন (ডাচ) মাইল দূরে একটি জায়গা আছে যেখানে পর্তুগীজরা জাহাজ নোঙর করে। নদীতে কতকগুলি খাড়ি রয়েছে। এ জন্য ২০০ টন অবধি মাপের জাহাজগুলি থেকে এখানে সহজে মাল খালাস করতে পারে। কিন্তু বড় বড় জাহাজগুলি থেকে বরদেজেই মাল খালাস করতে হয়।

গোয়া শহরটি সুদৃশ্য বাড়ি-ঘর রাস্তাঘাট সহ বেশ সুন্দর ভাবে পর্তুগীজ ধাঁচে গড়ে উঠেছে। তবে গরমের দরুন বাড়ি-ঘরগুলি কিছুটা নীচু। বাগান ও ফুল-

বাগিচাগুলি সাধারণতঃ বাড়ির পিছন দিকে। সব রকম ভারতীয় ফলের গাছ রয়েছে সেখানে। দ্বীপের ভিতর অঞ্চলেও অনেক সুন্দর সুন্দর বাগান ও খামার রয়েছে। খেলাধুলা বা অবসর বিনোদনের জন্য প্রায়ই সেখানে যায় তারা, ভারতীয় মেয়েরা এতে খুব আনন্দ পায়। লিসবনের মতো এ শহরেও অনেক মঠ ও গীর্জা রয়েছে। তবে কোন বাগিন (Beguin) বা সন্ন্যাসিনী নেই। কেননা এমন মেয়ে খুবই কম যে এতদূরে আসবে ও রতি দেবীকে বর্জন করে কঠোর জীবন যাপন করবে। কি শীত কি গ্রীষ্ম দুই ঋতুতেই দ্বীপটির সবুজ সুন্দর চেহারা, সব সময়েই কোন না কোন ধরনের ফল বর্তমান। সত্যিই উপভোগ্য দৃশ্য। শহরটি লিসবনের মতোই কতক পাহাড় আর উপত্যকার উপর গড়ে উঠেছে।

আগে শহরটি বেশ ছোট ছিল। চারিদিক ছিল দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালের চারিদিকে পরিখাও ছিল, যা বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে শুকনো থাকতো। দেয়াল অবশ্য এখনো খাড়া রয়েছে। তবে ফটকগুলির অস্তিত্ব আর নেই। শহরও দেয়ালের বাইরে সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরের এলাকা বর্তমানে দেয়ালঘেরা এলাকার দু গুণেরও বেশি হবে। তাকে ঘিরে কোন রকম কোন দেয়াল নেই। তবে আগেই বলেছি, দ্বীপের পূবদিকে একটি দেয়াল রয়েছে। সলসেত্তি দ্বীপের ঠিক বিপরীত থেকে সেটির আরম্ভ হয়েছে। শেষ হয়েছে বরদেজ দ্বীপের কাছে এসে। আর কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই দ্বীপটিতে। তবে, বরদেজের বাঁকের মুখে, নদীকূলের কাছে, একটি পুরানো জরাজীর্ণ দুর্গ রয়েছে। দু তিনটি কামান আছে সেখানে। রাতে একজন লোকও পাহারা দেয়।

দ্বীপটি সমুদ্রের দিকে বেশ উঁচু। সমুদ্রের পানে ঝুঁকে পড়া খাড়া পাহাড়ে ভর্তি। কিন্তু বরদেজের সাগর উপকূল অতি সুদৃশ্য সাদা বালিতে ভরপুর। লম্বায় আধমাইল বা তারও বেশী হবে।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে দ্বীপের পূবদিকের দেয়ালে তিন চারটি ফটক রয়েছে। এগুলি একেবারে জলের কিনার ঘেঁষে। প্রত্যেক ফটকে একজন করে ক্যাপটেন ও একজন করে কেরাণী রয়েছে। অনুমতি পত্র ছাড়া কেউ যাতে মূল ভূ-খণ্ডে যেতে না পারে সেদিকে নজর রাখে। ভারতীয়, দক্ষিণী, মূর ও পৌত্তলিকদের মধ্যে যারাই এখানে বসবাস চাষ আবাদ করে তারা ঐ পথেই মূল ভূ-ভাগে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনতে যায়। যাবার বেলা তাদের বাহুতে একটি করে ছাপ মেরে দেয়া হয়। ফেরার বেলা সেটি দেখালে তবেই ঢুকতে পায়। এ জন্য তাদের কাছ থেকে দু বজারুকো করে আদায় করা হয়। এ অর্থ ওই ক্যাপটেন

ও কেরাণীর রোজগার। রাতে একজন ছোকরা সে ফটক পাহারা দেয়। ফটকের মাথায় একটি ছোট ঘন্টাও লাগান আছে। তেমন কিছু পরিস্থিতি দেখা দিলে সে পা দিয়ে ঘন্টার দড়িটির উপর চাপ দিয়ে সেটি বাজিয়ে জানান দেয়।

বিচার ও আরক্ষা বিধি-ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে পার্থিব ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই এখানকার সব কিছু পর্তুগালের মতো। শহরে পর্তুগীজেরা সব জাতির লোকের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে। ভারতীয়, পৌত্তলিক, মূর, ইহুদী, আর্মেনীয়, গুজরাটী, বেনিয়া, ব্রাহ্মণ এবং সব ধরনের ভারতীয় জাতির লোকই রয়েছে এখানে। তারা যেমন এখানে বসবাস করে, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও যাতায়াত করে। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে। কোন লোককেই তার বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় না। তবে মৃত ও জীবন্তদের দাহ করা, বিবাহ অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কুসংস্কারপূর্ণ দানবিক আচার-প্রথা প্রকাশ্যে পালন করা (ভিন্ন ধর্মীদের জন্য) আর্ক-বিশপের দ্বারা নিষিদ্ধ। তবে মূল ভূ-ভাগে এবং দ্বীপে গোপনে নিজের গৃহ মধ্যে এ সব তারা করতে পারে। কিন্তু, খ্রীষ্টানদের বিরক্তি উৎপাদন না ক'রে। যারা সদ্য সদ্য খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিধি নিষেধ বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

লৌকিক প্রশাসন ও ন্যায় বন্টনের ক্ষেত্রে সকলের জন্য একই নিয়ম। সব কিছুই পর্তুগীজ বিধি-বিধানের অধীন। যে একবার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে তাকে কোনরূপ পৌত্তলিক কুসংস্কার পালন করতে দেখা গেলে ধর্মীয় বিচারালয়ে তার অনুসন্ধান ও বিচার হয়। তা অপরাধী যিনিই হোন না কেন আর অপরাধ ধর্মীয় দিক থেকে যে কোন ধরনেরই হোক না কেন।

জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যাদির মধ্যে কিছুই প্রায় এ দ্বীপে নেই। কেবল যা কিছু কিছু গরু-বাছুর, মুরগি, ছাগল, ঘুঘু এসব। তাও খুবই কম। এখানকার অনুর্বরতা ও খারাপ ভৌগলিক অবস্থানই এর কারণ। জমি অতি পাথুরে, রুক্ষ, কোথাও বন জঙ্গল, কোথাও বা ধু ধু পতিত। প্রয়োজনীয় সব কিছুই সলসেত্তি ও বরদেজ থেকে আসে। তবে সিংহভাগ আসে মূল ভূ-খণ্ড থেকে। খাদ্য-শস্য, চাল, অন্যান্য ফসল, তেল ও নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিষই অন্য স্থান থেকে আনতে হয়। এবং জলপথে। যেমন ধরো, কাম্বে থেকে, মালাবার থেকে। তালের মদ এখানে প্রচুর, বাইরেও জোগান দেয়া যেতে পারে। কিন্তু পানীয় জলের খুবই অভাব। শহরের বাইরে প্রায় সিকি মাইল

দূরে একটি মাত্র কুয়া আছে। সেটির নাম ব্যানগানিন। পুরো শহর এর উপর নির্ভর করে। ক্রীতদাসেরা সেখান থেকে জল তুলে এনে বিক্রী করে শহরে। এ জল খেতে খুবই ভাল। রান্নাবান্না ও অন্য সব কাজের জন্য বাড়ি বাড়ি কুয়া রয়েছে। এখানকার জমি যেমন পাথুরে তেমন শুষ্ক। লোহার প্রাচুর্য্যের জন্য মাটির রঙ লাল। মাটি দেখে কতক ইতালিয়ান রসায়নবিদ মত দিয়েছেন যে এখানে তামা ও সোনা পাওয়া যাবে। তবে রাজা বা শাসনকর্তা কেউ সেদিকে আগ্রহ দেখাননি। ভয়, পাছে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে চারিদিকে ঘিরে থাকা শত্রুরা সেই সম্পদের লোভে এখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিরাট কোন বিপদ ডেকে আনে।

দশ : গোয়া শহর ও বন্দর

ভারতপ্রবাসী পর্তুগীজদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করেছেন। এ ধরনের বিয়ে থেকে যে সব সন্তান জন্মলাভ করেছে তাদের বলা হয় মেষ্টিশো (অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর)। এদের গায়ের রঙ সাধারণতঃ হলুদ ঘেঁষা। তবে মেয়েদের মধ্যে অনেকেই সুগঠিতা, সত্যি সত্যিই সুন্দরী।

যারা ভারতে জন্মেছে এমন মূল পর্তুগীজ সন্তানদের সেখানে কাষ্টিশো বলা হয়। অন্য সব দিক থেকে এরা (য়ুরোপীয়) পর্তুগীজদের মতো হলেও গায়ের রঙ একটু অন্যরকম। অনেকটা হলুদ হলুদ। এদের সন্তানরা পেয়েছে আবার মেষ্টিশোদের মতোই রঙ।

অপরদিকে, মেষ্টিশোদের সন্তানরা পেয়েছে ভারতীয়দের রঙ ও আকৃতি। অর্থাৎ পুরোপুরি দক্ষিণীদের চেহারা।

এদের জীবিকা ব্যবসাবাণিজ্য। এই সূত্রে এদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে বাঙলা, পেগু, মালাক্কা, কাম্বে, চীন ও আরো বিভিন্ন দেশের সঙ্গে।

গোয়াতেও প্রতিদিন বিভিন্ন দেশ থেকে লোক আসে। ভারতের সব অঞ্চল থেকে। প্রতিবেশী দেশগুলি থেকেও। সাধারণ-অভিজাত ও ব্যবসায়ী দু' ধরনেরই। চলে, সব রকমের ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর কেনাবেচা। দেখলে মনে হবে, বুঝিবা এক মেলা বসেছে।

বেচাকেনার এই মেলা সাধারণতঃ প্রত্যেক দিন সকালের দিকে বসে। বন্ধ থাকে শুধু যা রবিবার আর উৎসবের দিনে। শুরু হয় সকাল ৭টায়, শেষ হয় বেলা ৯টায়। স্থান, শহরের প্রধান সড়ক। নাম তার ষ্ট্রেট স্ট্রীট। সাধারণতঃ লিলন (নিলাম) বলা হয় এই মেলাকে। এই লিলনে ডাক তুলে পণ্য বিক্রীর জন্য শহরের তরফ থেকে হাঁক-দার নিয়োগ করা হয়।

বিভিন্ন জাতির বন্দী আর ক্রীতদাসও এ বাজারে নিয়মিত বিক্রী হয়ে থাকে। নারী-পুরুষ দুই-ই। কচি বুড়ো সব রকম বয়সের। ঠিক জন্তু জানোয়ারদের মতোই এদের কেনা-বেচা চলে। যে যার খুশী মতো দেখে শুনে বেছে কিনে নেয় নিজের পছন্দমতোটিকে। গুণে দেয় যার যে রকম দাম তাই।

আরবী ঘোড়া, সবরকম মশলাপাতি, শুকনো ওষধি, জমাট মিঠাই দ্রব্য প্রভৃতিও বিক্রী হয়। বিক্রী হয় কাম্বে, সিন্ধু, বাঙলা, চীন ও আরো নানা দেশ

থেকে আমদানি করা মিহি ও দামী দামী শয্যা-আবরণী, হাজার রকমের চমকদার সব জিনিষ।

কেউ মারা গেলে তার বিষয় সম্পত্তি, জিনিষপত্রও এই বাজারে ডাক তুলে বিক্রী করে দেয়া হয়। তা যে কোন লোকেরই হোক না কেন। অনাথ ও বিধবারা যাতে অযথা হয়রানিতে না পড়ে, ন্যায় বিচার পায়, এ জন্যেই এই ব্যবস্থা। বিক্রীর ব্যাপারে যাতে অযথা বিলম্ব না ঘটে সেদিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়। প্রতি বছর শহরে বহু লোক মারা যায় বলে প্রচুর মাল-পত্র বিক্রী হয় এভাবে। মৃত্যুর হার এরূপ বেশি হওয়ার একটি কারণ উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন, আরেকটি কারণ হলো এখানকার গরম।

পর্তুগীজরা যেখানেই বসতি গড়েছে সেখানেই একটি ক'রে এ রকম লিলন বা নিলাম-বাজার রয়েছে।

বিয়ে থা ক'রে যে সব পর্তুগীজ ঘর-সংসারী হয়েছেন তাদের মধ্যে কতক ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের সাহায্যে নিজেদের জীবিকা উপার্জন করে থাকেন। কারো বারো, কারো কুড়ি, কারো বা তিরিশ জন ক্রীতদাস-দাসী রয়েছে। এদের পালন খরচ খুবই কম। যাকে যে ধরনের কাজে লাগানো হয় তা-ই সে করে। কেউ হয়তো পরিষ্কার জল তুলে এনে তা বিক্রী করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে। ক্রীতদাসীরা তৈরী করে ভারতীয় ফলফলাদি থেকে নানারকম মিঠাই, মোরব্বা, আচার ইত্যাদি। নানারকম কাটা ও সেলাইয়ের কাজ, সূচী শিল্পকর্মও করে। যে সব ক্রীতদাসী বেশ সুন্দরী ও যুবতী তারা সুদৃশ্যভাবে সেজেগুজে মনিবের নির্দেশে ওই সব বস্তু নিয়ে পথে পথে বিক্রীর জন্য ঘুরে বেড়ায়। এদের রূপ ও পরিপাটি চেহারা দেখে অনেকেই তাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। জিনিষও কেনে। তবে সে সব কেনার চেয়ে কাম-চরিতার্থ করার জন্যই লোকে এদের প্রতি বেশি ঝোঁকে। এরাও এ ব্যাপারে বৈরাগ্য দেখায় না। সত্যি কথা বলতে কি এদের বেশির ভাগই ওই পথে রুজি-রোজগার করে। যাতে তাকে আরো বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখে সেই আশায় তা এনে মালিকের হাতে তুলে দেয়।

অনেক ঘরসংসারী পর্তুগীজ মুদ্রা কেনা-বেচা ও বিনিময়ের কাজ করেন। মন্দার সময়ে দশ থেকে বারো শতাংশ লাভে 'রিয়েল-অষ্টক' (Rials of eight) পর্তুগীজ মুদ্রা কিনে মরশুমের সময়ে পঁচিশ থেকে তিরিশ শতাংশ লাভে বেচে। লারিঁ (Larriins) নামে যে সব মুদ্রা হরমুজ থেকে আসে তাকে আট থেকে দশ শতাংশ কম দরে কিনে রাখে ও পরে কুড়ি থেকে পঁচিশ শতাংশ চড়া দামে

বেচে। কোচিন থেকে গোলমরিচ ও অন্যান্য পণ্য সস্তার কিনতে হলে লারি নিতান্ত আবশ্যক। এটাই হলো সব থেকে নির্ভরযোগ্য ও লাভদায়ক মুদ্রা। এছাড়া আরো সব মুদ্রা রয়েছে। প্যাগোডা (মন্দির চিত্র সম্বলিত), ভেনেশীয় এবং সন থোম (সন্ত থমাস)। তিনটিই স্বর্ণ মুদ্রা। সব রকম মুদ্রারই কেনাবেচা ও বিনিময় করেন তারা। অনেকেই তারা এ ছাড়া আর কোন কিছু করেন না। এবং এ ব্যবসা করেই বেশ ধনী। এ সব বিদেশী মুদ্রার বেশির ভাগই আসে ধর্মীয় সংস্থা বা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে। কাউকে বিপদে না ফেলা বা না ফাঁসিয়ে দেবার জন্য এরা সাধারণতঃ অন্য লোকের মাধ্যমে গোপনে এগুলি বিনিময় করে।

বহু পর্তুগীজ শুধু নারকেল গাছ থেকে যা উপার্জন হয় তাতেই চলেন। এ দ্বীপটিতে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর মধ্যে এটি প্রধান। এ থেকে অনেকেই ভালো রোজগার করেন ও তা দিয়ে আরামে জীবনযাপন করেন।

অনেকে আবার গাছগুলি ভাড়া দিয়ে দেন। এজন্য প্রত্যহ তারা গাছ পিছু আধ পরদাওয়ে বা তার কিছু বেশি পেয়ে থাকেন। আধ পরদাওয়ে এক ক্যারোলাস গিলডার্নের সমান। এদের কারো কারো বাগানে ৩০০, ৪০০ বা তার চেয়েও বেশি গাছ আছে। ভাড়া দেয়া হয় সাধারণতঃ কানাড়ীদের কাছে। ভারতে পর্তুগীজ ও মেষ্টিশোরা অন্য কোন ধরনের পরিশ্রমের কাজ বড় একটা করে না। যে সব কাজের কথা এতক্ষণ বলা হলো তাই যা করে। তবে হস্তশিল্পের কাজে নিযুক্ত রয়েছে এমন কিছু লোক আছেন। এরা টুপী, জুতা, পাল তৈরী ইত্যাদির কাজ করেন। কিন্তু এদের বেশির ভাগই ক্রীতদাস রেখে তাদের দিয়ে এসব কাজ করিয়ে নেন। নিজেরা যখন পথেঘাটে চলাফেরা করেন তখন এদের দেখে কার সাধ্য যে বলবে এরা ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোক নন। গরিব হোক, ধনী হোক সকলেই এখানে কথাবার্তা, চালচলন ও আচার ব্যবহারে একই রকমের।

অন্য আর যতো হস্তশিল্পের কাজ তা ভারতীয়, পৌত্তলিক ও দেশীয় খ্রীষ্টানরা ক'রে থাকে। এ শহরে কেউই মুক্ত বাসিন্দা হবার সুযোগ পায় না। যারা এখানে বিয়ে করেছে বা যাদের বাসগৃহ রয়েছে একমাত্র তারাই বসবাসের সুযোগ পায়।

দুই শ্রেণীর লোকের বাস এখানে। এক : বিবাহিত; দুই : সৈন্য। অবিবাহিত যুবকরা সকলেই এখানে নিজেদের সৈন্য বলে পরিচয় দেয়। কেননা, এর চেয়ে

গৌরবজনক বিশেষণ আর নেই। এর মানে এই নয় যে এরা সকলেই সৈন্য-বাহিনীতে কাজ করে কিংবা করতে দায়বদ্ধ। সারা পর্তুগীজ ভারতের কোথাও সে রকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পর্তুগাল থেকে কোন ব্যক্তি এখানে এলে মনোমত যেখানে খুশী সে বসবাস করতে পারে। জাহাজে আসার সময় প্রত্যেকের নাম-ধাম-পরিচয়, কার কিরূপ মাইনে ধার্য হয়েছে তা নথিভুক্ত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কারো কারো উপাধি হয়তো **Fidalgo de caza del Rey nossas Senor** বা রাজপুরীর ভদ্রমহোদয়। উপাধি মধ্যে এটিই হলো সব থেকে সম্মানজনক। কতকের উপাধি **Mozos Fidalgos**। এটিও যথেষ্ট গৌরবজনক। এরা সাধারণতঃ সব অভিজাত ঘরের সন্তান বা রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত। কতক আছেন যাদের উপাধি হলো **Caval hiero Fidalgo**। মর্যাদার দিক থেকে এর স্থান অন্য দুটির পর। এটি আসলে নাইট বা বীরত্বসূচক উপাধি। শৌর্য প্রকাশক কোন না কোন কৃতিত্বের জন্য এ উপাধি বিতরণ করা হয়ে থাকে। ব্যাপারটা এত সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে অতি ছোকরা বয়সী ও সাধারণ স্তরের লোকেরাও যে কোন উপায়ে নাইট উপাধি পেয়ে যায়। এছাড়া আরো কতক উপাধি রয়েছে। যেমন ধর **Mosos da Camara, do Numeroe, do Servico**। এরা রাজ কর্মচারী। কতক বাণিজ্য বিভাগের, কতক হিসাব-রক্ষা বিভাগের, কোনটা বা তার সেবার জন্য। কতকের উপাধি আবার **Escuderos, Fidalgos**, তার মানে, **esquires**, এটিও কিছুটা সম্মানসূচক উপাধি। অন্যদের সাধারণতঃ **Hommes Honorados** বা মাতৃভূমির সম্মানিত ব্যক্তিরূপে অভিহিত করা হয়। যারা একেবারে গরিব ও সাধারণ তাদের শুধু সৈন্য রূপে নাম লেখা হয়, কোন উপাধি দেয়া হয় না। এদের প্রত্যেককে তাদের উপাধি বা পদমর্যাদা অনুসারে মাইনে দেয়া হয়। কর্মদক্ষতার পরিচয় দেখিয়ে যে কেউই আরো উঁচুপদে যেতে পারেন, উপাধিতে ভূষিত হতে পারেন।

স্বদেশ থেকে আসার সময় যে খাতাটিতে এদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে ভারতে পৌঁছবার পর সেই খাতাটি এখানে নিযুক্ত একজন রাজকর্মাধ্যক্ষের হাতে তুলে দেয়া হয়। এধরনের কর্মাধ্যক্ষদের চাকুরীর মেয়াদ সাধারণত তিন বছর। তার পরেই তার স্থানে নতুন লোক আসেন। এই কর্মাধ্যক্ষ হলেন ম্যাট্রিকোলা-জেনারেল (নিবন্ধক মহালয়)-এর প্রধান করণিক। তার অধীনে তিন-চার জন করণিক কাজ করেন।

ভারতে গ্রীষ্মকাল দেখা দিলে কোন না কোন অভিযানের জন্য লোক নিয়োগের

প্রয়োজন দেখা দেয়। বণিকেরা যাতে নিরাপদে জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে চলাচল করতে পারে সেজন্য উপকূলভাগ প্রহরা দেয়া হয় এ সময়ে। মালাবারী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও লোকের প্রয়োজন পড়ে। বর্ষা শেষে সেপটেমবর মাসে গ্রীষ্মকাল এলে (অর্থাৎ জাহাজ চলাচলের মরশুম শুরু হলে) এজন্য চারি-দিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেয়া হয় : যারা রাজার নৌবহরে এ সময়ে কাজ করতে চান তারা যেন নিবন্ধক মহালয়ে এসে নাম লিখিয়ে অর্থ নিয়ে যান। প্রত্যেকটি গ্যালীতে একশো জন ও প্রত্যেকটি 'ফাস্তে'-তে কমবেশি তিরিশ জন করে লোক নেয়া হয়। পর্তুগাল থেকে আসার সময় যাকে যে স্তরভুক্ত রূপে নিবন্ধন করা হয়েছে তিনি সেই মতো মাইনে পান। এই অর্থ প্রতি তিনমাস অন্তর নিবন্ধক মহালয় থেকে দেয়া হয়। এক একজন সাধারণ সৈনিক ৭ পরদাওয়ে বা জেরাফিন (আশরফি) ও সম্ভ্রান্তরা ৯ পরদাওয়ে। **Moso da Camara** বা বাণিজ্য কর্ম-চারী ১১ পরদাওয়ে এবং এরূপ ধাপে ধাপে উঁচু বেতন। এছাড়া প্রত্যেক ক্যাপটেনও নিজের পকেট থেকে সৈন্যদের কিছু কিছু উপরি দেন। কেন না, প্রত্যেকেই তারা নিজের দলে সেরা সৈন্যদের রাখতে চান। তার তদারকীতেই যাতে বেশি খাদ্য ও পণ্যসম্ভার কেনা হতে পারে সেদিকেই তাদের লক্ষ্য। সৈন্য-দের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। এজন্য ক্যাপটেন সকলের সাথে অতি সদয় ও মধুর ব্যবহার করে থাকেন। সকলের সঙ্গে একই টেবিলে একসাথে বসা-ওঠা, খানা-পিনা করেন সমুদ্রে থাকা কালে।

নৌবহর প্রহরায় বার হবার পর উপকূল ধরে আগুপিছু সাগরে টহল দিয়ে বেড়ায়। কখনো বা কোন বন্দরে থাকে। এপ্রিল মাস পর্যন্ত এভাবেই কাটায়। ওই মাসের শেষাশেষি তারপর গোয়া নদীতে ফিরে আসে। চলে অবসর যাপন। সৈন্যদের ছেড়ে দেয়া হয়। এসময় তারা যে যার স্বাধীন ইচ্ছা ও পরিকল্পনামতো জীবন যাপন করে। সরকার থেকে কোন বেতন পায় না।

এই (মরশুমী) কার্যকাল শেষে শাসনকর্তা ক্যাপটেনকে একটি প্রশংসাপত্র লিখে দেন। তিনি কতদিন ধরে কোন অঞ্চল সুরক্ষা করেছেন, কী কী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এজন্য নিজের পকেট থেকে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন তার সব বিবরণ বিশদভাবে দেয়া থাকে। ওই ভাবে ক্যাপটেনও আবার তার সহকারী-দের, ও সৈন্যদের প্রশংসাপত্র লিখে দেন।

কতক অভিজাত এ সময়ে সৈন্যদের জন্যে তাদের গৃহ অবারিত রাখেন। সেখানে তারা পরস্পর মেলামেশার জন্য জমায়েত হয়। এ ব্যাপারেও তাদের

প্রশংসাপত্র দেয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যা কিছুই করেন তার জন্যই প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেন তারা। এ ভাবে খান দশ-বারো-কুড়ি প্রশংসাপত্র সংগৃহীত হলে শাসকর্তার কাছ থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসে। ওইগুলি পেশ করে দেশ সেবার প্রতিদান বা পুরস্কার প্রার্থনা করে।

ভারত প্রবাস কালে তাদের সদাচরণের সাক্ষ্যরূপে নিবন্ধক মহালয় থেকে একখানি প্রশংসাপত্র আনা আবশ্যক। কাজের গুরুত্ব অনুসারে তারা তাদের সেবার পুরস্কার লাভ করেন স্বদেশে। রাজদরবারে তার হয়ে কথা বলার মতো কোন বন্ধু-বান্ধব থাকলে কিংবা হাত তৈলাক্ত করার ক্ষমতা থাকলে সেই পথে তারা তিন বছর মেয়াদের উঁচু পদের চাকরীগুলির কোন একটি সংগ্রহ ক'রে ফেলেন। এসব চাকরীর মধ্যে রয়েছে ক্যাপটেন, প্রতিনিধি, করণিক, বিচারক ইত্যাদি এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য সব পদ। এ চাকরি অন্যকে হস্তান্তর করা চলেনা, নিজেকেই করতে হয়।

বিশেষ অনুগ্রহ রূপে অনেকে আবার লাইসেন্সও পেয়ে থাকেন। এগুলি হস্তান্তর যোগ্য। তাই, অন্যের কাছে এগুলি বেচে দেন তারা, নয়তো মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেন।

এই সব পেটেন্ট বা সনন্দ পত্রগুলি চ্যান্সারী ও সর্বোচ্চ আদালতের একটি বিশেষ বিভাগে নিবন্ধ ভুক্ত করা হয় ও ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে সেগুলি শাসনকর্তার দ্বারা সমর্থিত হওয়া আবশ্যিক। ওই বিশেষ পদের জন্য পূর্বে অন্য কাউকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়ে থাকলে ক্রম অনুসারে একজনের পর অন্যজন পদটি লাভ করেন।

ন্যায় ও সাম্য বজায় রাখার জন্য সেখানে পর্তুগালের মতো বিচার বিভাগও রয়েছে।

এগারো : পর্তুগীজ, মেষ্টিশো ও দেশীয় খ্রীষ্টানদের জীবনধারা

বিবাহিত পর্তুগীজ, মেষ্টিশো ও (দেশীয়) খ্রীষ্টানদের বাড়িগুলি বেশ সুশ্রী, ছিমছাম পরিষ্কার ও সাজানো গোছানো। তারা যে যার সাধ্যমতো পাঁচ-ছয় থেকে কুড়ি বা তারো বেশি বান্দা ও বাঁদী পুষে থাকেন। নিজেদের ঘরদোর, গৃহস্থালীর যে কোন ব্যাপারেই তারা সুরুচি বোধ সম্পন্ন, পরিপাটি। বিশেষ করে পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে। প্রতিদিন তারা সার্ট ও স্মোক বদল করেন। মেয়ে পুরুষ সকলেই। এমন কি বাঁদী ও বান্দারাও। এদেশের অত্যধিক গরম আবহাওয়ার জন্যই তারা এরূপ করে থাকেন।

পর্তুগীজরা বেশ গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলে। অভিজাত, সাধারণ ও সৈনিক কারো মধ্যে কোন প্রভেদ চোখে পড়ে না এ ব্যাপারে। চালচলন, কথাবার্তা সৌজন্য সব কিছুতেই এই সমতা। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার বেলা বেশ ধীর গতিতে পদক্ষেপ করেন তারা। গৌরব ও আত্মমহিমার একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে তাদের সেই চলার ভঙ্গিমায়। রোদে কি বর্ষায় যাতে তার কোন অসুবিধা না হয় সে জন্য একটি বিরাট টুপী কিংবা ছাতা ধরে একজন বান্দা ছায়ার মতো সদাসর্বদা তার পিছেপিছে রয়েছে। বর্ষার সময় সাধারণতঃ একজন বালক বান্দা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। হাতে থাকে উজ্জ্বল লাল রঙের একটি গাত্রাবরণ বা ওই ধরনের কোন বস্ত্র। বৃষ্টি নামলে সে তার প্রভুর গা ঢেকে দেয় ওইটি দিয়ে। সকালের দিক হলে সে চামড়া বা সিল্কের তৈরী একটি বসার গদী নিয়ে চলে সাথে। লোকজনের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রভু যাতে বসতে পারেন সেজন্য। চলাফেরা করতে বা মহিমা ব্যঞ্জক সুগম্ভীর ভাবটি অক্ষুন্ন রাখতে প্রভুর যাতে কোন রকম অসুবিধা দেখা না দেয় সেজন্য তার রেপিয়ার বা তরবারিটি বালক বান্দা বয়ে নিয়ে চলে।

রাস্তায় কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলে দুজনে কাছাকাছি হবার আগেই পরস্পরের দিকে শরীর ঝুঁকিয়ে তারা প্রীতি সম্ভাষণ বিনিময় করে। সামনের দিকে সজোরে পা এগিয়ে পরস্পরকে স্যালুট জানায়, টুপিটা খুলে প্রায় মাটি পর্যন্ত নামিয়ে আনে।

এলে বান্দা তার জন্য টুল নিয়ে অপেক্ষা করে। আশেপাশের সকলে ও নবাগতরা বর্ণিত প্রথায় তাকে সম্মান দেখান। যারা সম্মান দেখিয়েছেন তাদের কাউকে যদি তিনি উপেক্ষা ক'রে প্রতিসম্মান না দেখান তবে দলবদ্ধভাবে সকলে তার বিপক্ষে যায়। অভদ্রতার শাস্তি হিসাবে তার টুপীটি কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। কোন ব্যক্তি অসৌজন্য দেখিয়ে থাকলে বা অন্য কোন কারণে তার উপর প্রতিশোধ নিতে চাইলে দশ বা কুড়ি জন বন্ধু বা পরিচিতদের নিয়ে দল বেঁধে যেখানেই তার দেখা পায় পিটিয়ে পিটিয়ে তাকে মেরে ফেলে বা আধমরা ক'রে ছেড়ে দেয়। অনেক সময় বান্দা লাগিয়ে ছুরি মেরেও হত্যা করা হয়। এ ধরনের প্রতিশোধ নেয়াকে তারা বিরাট গৌরবের ব্যাপার, ন্যায়পরায়ণ-তার পরিচায়ক বলে মনে করে। এ জন্য প্রকাশ্যে গর্ব করেও থাকে। যদি তাকে একেবারে মেরে ফেলতে না চায় তবে কোমর সমান লম্বা একটি মোটা নল দিয়ে তার হাড় পাঁজর ও সারা শরীরে আঘাত করে। এই নলকে তারা বাঁশ বলে থাকে। এরূপ মারের ফলে তাকে ৮০ দিন বা তারও বেশিকাল শয্যাশায়ী হয়ে কাটাতে হয়। অনেক সময় এভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরেও ফেলে। এই-ই তাদের চলতি প্রথা। কখনো বিচার বুদ্ধি দিয়ে একে তলিয়ে দেখা হয় না, সংশোধনের চেষ্টা করা হয় না।

অনেক সময় বালি ভর্তি থলে দিয়ে পিটিয়েও তারা পরস্পরের হাড়গোড় ভাঙে, খোঁড়া বানায়। (শেষের এই প্রথাটি দক্ষিণ ভারতীয়)।

কারো বাড়িতে দেখা করতে গেলে, আগন্তুক যত সাধারণ ব্যক্তি-ই হোন না কেন গৃহকর্তা টুপী খুলে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তাকে সমাদরে বসার ঘরে নিয়ে আসেন। বিদায় বেলা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানান। এ সময়ে গৃহকর্তা তার সঙ্গে অসম আচরণ করলে বা তাচ্ছিল্য দেখালে সে অপরাধের জন্যও তাকে ওই রূপ শাস্তি ভোগ করতে হয়।

বিয়ের বেলা মোটামুটি অবস্থাপন্নদের মধ্যে বন্ধু-বান্ধব ও নিমন্ত্রিতরা ঘোড়ায় চড়ে বর ও কনের সঙ্গে যায়। কারো ঘোড়া না থাকলে সে ধার ক'রে আনে। ভালো সাজসজ্জা ক'রে সকলে সমবেত হন। এক একটি বিয়ের শোভাযাত্রায় পঞ্চাশ থেকে একশো পর্যন্ত ঘোড় সওয়ার সমবেত হতে দেখা যায়। বর-কনের পিতামাতা থাকেন শোভাযাত্রায় সকলের পিছনে। বর থাকে দুজনের ধর্মপিতার সঙ্গে তার পরের সারিতে। তারপর চলে কনে, দু পাশে দুই ধর্মমাতার সাথে সাথে। প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক পালকিতে। এই পালকি প্রচুর অর্থ খরচ ক'রে

তৈরী করা হয়। কনের পিছু পিছু চলে বান্দা-বাঁদীরা সারি বেঁধে।

গীর্জায় পৌঁছবার পর রোমান গীর্জার বিধি প্রথা মতো বিয়ে সম্পন্ন হয়।

তারপর আবার বর কনেকে নিয়ে অনুরূপ শোভাযাত্রা ক'রে বাড়ি ফেরে সবাই। শোভাযাত্রা পথ অতিক্রম করার বেলা প্রতিবেশিরা ভারতীয় গালিচার উপর বসে জানালা দিয়ে সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'রে চলেন। বর কনের উপর সুগন্ধি জল, চিনির তৈরী মিঠাইয়ের টুকরো, শস্য ও গোলাপ ফুল বৃষ্টি করেন তারা। তাদের বান্দারা এ সময়ে ভেরী ও বাঁশী বাজিয়ে সঙ্গীতের সুমধুর তান তোলে।

বাড়ির ফটকে পৌঁছে বর-বধূ অতি বিনয় ভরে সমবেত অতিথিদের কাছে বিদায় নেয়। অতিথিরা তখনো ঘোড়ার পিঠে।

বরবধূ ধর্ম মাতাদের সাথে বাড়ির ভিতরে গিয়ে একটি জানালার কাছে মর্যাদা ব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় আসন নেয়। অতিথিরা প্রত্যেকে তখন একে একে তাদের শুভেচ্ছা জানাতে আসেন। একটানা বেজে চলে সানাই (Shalmes), যা ভারতে অতি চালু। যারই অর্থ আছে তিনিই এগুলি বাড়িতে রাখেন।

শুভেচ্ছা জানাতে সবার আগে আসেন ধর্মপিতা দু'জনে। তারপর একে একে অন্য সকলে শুভেচ্ছা ও সম্মান জানিয়ে সার বেঁধে বর-কনের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যান। তারপর ধর্মপিতারা আবার উপস্থিত হয়ে বর-বধূ যাতে আনন্দে জীবন কাটাতে পারেন সেজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান। এরপর অতিথিদের মিঠাই ও জলপানের ব্যবস্থা করা হয়। শেষে নব দম্পতীকে শুভেচ্ছা ও প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে সকলে বিদায় নেন।

বর-বধুর সঙ্গে থেকে যান শুধু তিন চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের লোকজন। ভোজের আয়োজন করা হয় একমাত্র এদের জন্যই। এই ভোজে খাদ্যের পরিমাণ খুবই সীমিত থাকে। তবে প্রচুর অর্থ খরচ ক'রে বেশ দামী ভোজই দেয়া হয়। খানাপিনা খুব শান্তভাবে চলে, বিশেষ কথাবার্তা, গল্প-গুজব হয় না।

এরপর কনেকে শয্যায় নিয়ে যাওয়ার পালা। এ সময় কোনরকম অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর হয় না।

প্রায়ই দেখা যায়, সূর্য অস্ত যাবার ঘন্টা দুয়েক আগেই হয়তো কনেকে শয্যায় পাঠান হয়েছে। আমরা দেশে এজন্য যতক্ষণ অপেক্ষা করি অতো ধৈর্য দেখাতে পারে না এরা।

কোন শিশুকে যখন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় তখনও সকলে ঘোড়ায় চেপে শোভাযাত্রা ক'রে যান। শোভাযাত্রায় সকলের শেষে থাকেন পিতা। তারপর

পদব্রজে দুজন বান্দা। একজনের হাতে রূপার বা গিলটি করা পাত্রে ক্রাকলিংয়ের এক রকমের রুটি। পর্তুগীজরা এই রুটিকে রসকুইলহো বলে। পাত্রের মাঝে বসানো থাকে একটি বড় মোমবাতি। এটি বেশ যত্ন ক'রে তৈরী ও গিলটি করা। এর মধ্যে কয়েকটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। যিনি দীক্ষা দেবেন সেই পুরোহিতের প্রাপ্য এগুলি। পাতাটির মুখ গোলাপ ফুল দিয়ে ঢাকা। অন্য-জনের এক হাতে একটি রূপার বা গিলটি করা লবণের পাত্র ও অন্য হাতে একই ধাতুর তৈরী একটি প্রদীপ। দুজনেরই কাঁধে বেশ দামী ও সুন্দর তোয়ালে।

এদের পর চলেছে দুটি পালকি। একটিতে তার ধর্ম মা, অন্যটিতে ছেলেকে নিয়ে ধাই মা।

ফেরার বেলায়ও একই ভাবে শোভাযাত্রা করে ফেরে। বিয়ের উৎসবের মতোই সানাইয়ের সুমধুর সঙ্গীত বাজে। যে জানালার সামনে ধর্ম-মা ছেলেকে নিয়ে বসেছেন তার সামনে ঘোড়ার কসরৎ দেখানো হয়।

এবার অবিবাহিত বা সৈনিকদের কথা বলি। গ্রীষ্মকালে (মরশুমে) তারা রণতরী বহরে ক'রে সাগরে থাকে। ওই সময়ে তারা যখন কোন শহরে বা ডাঙায় নামে, পরনে থাকে প্রায় রাজকীয় পোষাক আশাক। হাঁটার ভঙ্গিমায় ফুটে ওঠে বিরাট মহিমাব্যঞ্জক ভাব। ভাড়া করা লোক তাদের পিছু পিছু চলে টুপী নিয়ে রোদ ও বর্ষার হাত থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য। দৈনিক মজুরী দিয়ে এ কাজে নিয়োগের জন্য অনেক ভারতীয়কে পাওয়া যায়। এ জন্য দেয়া হয় তাদের দৈনিক ১২ বসারুকো। এই অর্থ দুই স্টিভার বা এক স্টোটার। এর বিনিময়ে তারা যে ভাবে সেবা করে তা কোন চাকর করবে না।

এই সব পর্তুগীজদের বেশির ভাগই পর্তুগীজ ও মেষ্টিশো ঘরণী ও খ্রীষ্টান ঘরণী-দের অর্থে নিজেদের খরচ-খরচা ভরণ-পোষণ চালায়। এইসব ঘরণীরা তাদের অসৎ ও কুৎসিত বাসনা চরিতার্থ করার প্রতিদানে এদের উদারভাবে পুরস্কার ও উপহার দিয়ে থাকে। কী করে গোপনে পরিপাটিভাবে এ সব কাজ সম্পন্ন করতে হয় সেদিকে এই সৈনিকরা অতি কুশলী।

কতক আবার তাদের বন্ধু-বান্ধবদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য ক'রে সেপথে জীবিকা অর্জন করে। এরা তাদের প্রতিনিধিরূপে পণ্য সম্ভার নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। এদের 'ছাত্তিন' (চেট্টি—শ্রেষ্ঠী) বলা হয়। এদের অনেকেই এভাবে শেষ পর্যন্ত সৈনিকের কাজ ছেড়ে দেয়। আগেই বলেছি, আসার সময় নাম নিবন্ধীকরণ করিয়ে আসতে হলেও প্রত্যেককেই যে সেনাদলে কাজ করতে

হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে যতদিন না এরা বিয়ে-থা করে ঘর-সংসারী হয় ততদিন সৈনিক বলেই নিজেদের পরিচয় দেয়। চেট্টির কাজ করা এবং রাজার নৌ-বাহিনীতে কাজ করা এ দুয়ের দিকেই ইদানীং এদের প্রধান ঝোঁক। কেননা, আগে অভিজাতরা ও ক্যাপ্টেনরা যেভাবে সাহায্য সহায়তা দিতেন বর্তমানে সেরূপ আর করেন না।

উর্ধতন কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যেও বর্তমানে আগেকার সে তৎপরতা নেই। কেননা, মাত্র তিন বছরের জন্য তারা এ পদ পায়। তাও পূর্বে তারা যে সেবা করেছেন তারই পুরস্কার হিসাবে। সুতরাং পূর্বতন পদাধিকারীরা যে ধারায় সব কিছু চালিয়ে গেছেন মোটামুটি সেভাবেই চালিয়ে যান তারা। নতুন কিছু করার কোন উদ্যম বা উৎসাহ দেখান না। সকলেই বলে, আমার পর যিনি আসবেন তিনি করবেন। ফলে ভারতে নতুন কোন দেশ পর্তুগীজদের দখলে আসছে না। নতুন কোন দেশ আবিষ্কারও সম্ভব হচ্ছে না। বরং পূর্বে যা দখলে ছিল তারও কতক অঞ্চল খোয়াতে হয়েছে।

এ সত্বেও তাদের অনেক কাজ করতে হয়। যে সব অঞ্চল এখনও অধিকারে আছে তাকে রক্ষা করা, অপরের আক্রমণ প্রতিহত করা, উপকূলভাগ প্রহরা দেয়া। তবু, পর্তুগীজ সরকারের অবহেলার ফলে প্রতি বছর জলদস্যুদের হাতে অসংখ্য সওদাগরকে বিপুল ক্ষতি সইতে হয়। আশংকা হয়, পরিস্থিতি দিন দিন আরো খারাপের দিকে গতি করবে ; তার সব লক্ষণই প্রকট।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। ভারতীয় পর্তুগীজ ও তাদের জঙ্গী সরকারের যা কিছু কর্মতৎপরতা প্রধানতঃ সমুদ্রেই সীমাবদ্ধ। সামান্য কয়েকটি শহর, সেখানকার দুর্গ বন্দর ছাড়া আর কোন ভূ-ভাগ তাদের দখলে নেই। স্থলপথে যাতায়াত তাদের পক্ষে এজন্য একেবারে অসম্ভব। সেজন্য অন্য রাজ্য-গুলির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের। কিন্তু সেসব অঞ্চল বহু রাজ্য ও জাতিতে বিভক্ত। ওই রাজ্যগুলির মধ্যে আবার সদ্ভাব কম। সব সময়েই যুদ্ধ বিগ্রহ, শত্রুতা লেগে রয়েছে। এদের কতক যদিও পর্তু-গীজদের বন্ধু, কিন্তু কতক তেমনি আবার শত্রু।

বারো : পর্তুগীজ, মেষ্টিশো ও ভারতীয় খ্রীষ্টান নারীদের জীবনযাত্রা

ভারত-প্রবাসী পর্তুগীজ মেষ্টিশো ও ভারতীয় খ্রীষ্টান রমণীরা কদাচিৎ বাইরে বার হন। গীর্জায় বা বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ছাড়া কোথাও বড় একটা যান না তারা। যখন বাইরে যান তখনও কেউ যাতে তাদের দেখতে না পায় তার সব রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাধারণতঃ পালকিতে ক'রে যাতায়াত করেন তারা। বাইরে থেকে যাতে তাদের দেখা না যায় সেজন্য মাদুর বা কাপড়ের ঘের দিয়ে পালকি ঢেকে দেয়া হয়।

বাইরে যাবার বেলা তারা অতি মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পরেন। অলঙ্কারের মধ্যে রয়েছে সোনার ব্রেসলেট, আংটি, কানের আভরণ। এগুলিতে দামী-দামী রত্ন ও মুক্তা বসানো। পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য ব্যবহৃত হয় দামাস্ক, ভেলভেট, সোনার সুতা দিয়ে তৈরী বস্ত্র ইত্যাদি। সব থেকে শস্তা দামের বলতে রেশমের পোষাক।

বাড়ির ভেতরে সাধারণতঃ তারা খালি মাথায় থাকেন। গায়ে থাকে 'বাজু' নামের ওয়েষ্ট কোট। এতে তাদের ঘাড় থেকে নাভি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। এগুলি এত সূক্ষ্ম যে তা ভেদ ক'রে তাদের পুরো শরীর দেখা যায়। নাভির নিম্নাংশে থাকে তিন বা চার বার বেড় দিয়ে পরা চিত্রিত কাপড়। এ কাপড়গুলি ভারি সুন্দর। কতক কাপড়ে দামী দামী কারুকাজ করা। নানা প্রকার মূর্তি, বিভিন্ন রঙের ফুল লতাপাতা। এছাড়া গায়ে তাদের আর কোন পোষাক থাকে না। পায়ে ভারতীয় চটি। ধনী-গরিব, বৃদ্ধা-যুবতী সকলেই এধরনের পোষাক পরে বাড়িতে।

ভাত খেতে এরা এতো বেশি অভ্যস্ত যে রুটি প্রায় খায় না বললেই চলে। জলে চাল ফুটিয়ে ভাত রান্না করে। নোনতা মাছ, নোনতা আম, অথবা মাছ ও মাংসের অন্য কোন প্রকার ব্যঞ্জন দিয়ে তাই খায় তারা। খাবার বেলা এর সাথে পোটেজ বা গোলমরিচের জল (মিলগু-তান্নির—রসম ?) মেখে নেয় এবং হাত দিয়ে খায়। চামচ দিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ নেই। কাউকে তা দিয়ে খেতে দেখলে ঠাট্টা উপহাস করে। জলপানের জন্য ব্যবহার করে কালো রঙের একটি

মাটির পাত্র। পাত্রটি সুদর্শন, পাতলা ক'রে তৈরী। ফুল রাখার জন্য আমরা হল্যাণ্ডে যে ধরনের পাত্র ব্যবহার করি অনেকটা সেই রকমের। পাত্রটির মুখের কাছে একটি ঝাঁঝরি মতো রয়েছে। জল পানের বেলা সেটিকে তারা মুখের উপর তুলে ধরে, ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করে না। জল ঝাঁঝরি দিয়ে মুখের মধ্যে পড়ে। এক ফোঁটা জলও বাইরে ছিটকে পড়ে না। পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্যই তারা এভাবে জল পান করে। স্বদেশ থেকে সদ্য সদ্য আসা পর্তুগীজরা এভাবে জল খেতে গিয়ে প্রায় জলে বুক ভিজিয়ে ফেলে। তা দেখে এরা হাসাহাসি করে, 'রেইনল' বলে ঠাট্টাতামাসা করে। যারা স্বদেশ থেকে নতুন এসেছে ও ভারতীয় পর্তুগীজদের আদব কায়দায় কাঁচা, তাদের উপহাস ক'রে এ নামে বিশেষিত করে তারা।

এখানকার লোকেরা নিজ নিজ স্ত্রী সম্পর্কে ভারী স্পর্শকাতর। ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও অন্দর মহলে নিয়ে যায় না। স্ত্রী বা মেয়েদের সে দেখার সুযোগ পায় না। যদি বিশেষ কোন গল্পগুজব-আলোচনার ব্যাপার হয় কিংবা সে বিবাহিত হয় ও সস্ত্রীক এসে থাকে, আলাদা কথা। কোন আগন্তুক বাড়ি এলে স্ত্রী ও মেয়েরা সাধারণতঃ অন্দরে অদৃশ্য হয়ে যায়। পনেরো বা তার বেশি বয়স হলে কোন পুরুষকেই তারা অন্দর মহলে স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে বাস করতে দেয় না। এমন কি আপন পরিবারের ছেলেদেরও না। তখন তারা পৃথকভাবে অন্য ঘরে বা মহলে বাস করে। এর একটি কারণও আছে। প্রায়ই দেখা গেছে, হয়তো কারো খুড়তুতো বা মাসতুতো ভাই তার পিসীর সঙ্গে সহবাস করেছে। ভাই হয়তো বা অন্য ভাইয়ের বউ বা আপন বোনের সাথে। এমন কয়েকটি ঘটনা আমি জানি যেখানে এমন ঘটেছে ও স্বামীরা অপরাধীকে ও নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছে।

এখানকার রমণীরা বিশেষভাবে ভোগ বিলাসের প্রতি আসক্ত ও অসতী। এমন মেয়ে খুব কমই আছে যে বিবাহিত হয়ে দু-এক জন সৈনিকের সঙ্গে প্রমোদ ক'রে বেড়ায় না। এজন্য যে কোন রকম ফন্দীফিকির আঁটতে পিছ-পা নয় তারা। এমনকি অনেক সময় ধুতরার বীজ থেকে রস বার করে তা খাইয়ে স্বামীকে নেশায় আচ্ছন্ন বা চেতনাহীন ক'রে কিংবা ঘুম পাড়িয়ে তার সামনেই অন্যের সাথে প্রমোদে মত্ত হয়। স্বামী একথা জানতেও পারে না। মাদকের প্রভাবে সে দীর্ঘ চব্বিশ ঘন্টা আচ্ছন্ন থাকে। তবে ঠাণ্ডাজল দিয়ে পা ধুইয়ে দিলে সে ঘোর কেটে যায়। কোন কিছু সে বুঝতে পারে না। মনে করে সে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে এতক্ষণ।

স্ত্রী বিষ প্রয়োগ করার ফলেও অনেক স্বামী প্রাণ খুইয়েছে। এক ধরনের বিষ তৈরী ও প্রয়োগের ব্যাপারে এরা বেশ নিপুণা। এদিয়ে তারা খুশীমত যে কোন সময়ে লোককে মেরে ফেলতে পারে। এ বিষ অনেক সময় এমনভাবে তৈরী করা হয় যে কারো দেহে দু-বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে। ঐ কাল মধ্যে তার কোন ক্ষতি করে না। তারপর অব্যর্থভাবে সক্রিয় হয়ে তাকে মেরে ফেলে। এবং দু বা তিন বছর অথবা ওইরূপ মাস বা দিন পরে ক্রিয়াশীল বিষও তৈরী করতে জানে তারা। বহুবার এ রকম বিষ নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। এ-জিনিষ সেখানে খুবই সাধারণ ব্যাপার।

অনেক স্বামীও এভাবে তার স্ত্রীকে হত্যা করে। স্ত্রী ব্যাভিচারে জড়িত হলে বা মনে ওইরূপ সন্দেহ দেখা দিলে তারা এরকম পদক্ষেপ নেয়। কখনো বা তার গলা কাটে ও তার গোপন ব্যাভিচারের প্রত্যক্ষদর্শী রূপে তিন-চার জন সাক্ষী উপস্থিত করে। স্পেন ও পর্তুগালের আইন অনুসারে এর ফলে তারা দণ্ডের হাত থেকে রেহাই পায়ে, আবার বিবাহ করতে পারে।

কিন্তু এসব ঘটনা মেয়েদের মনে কোন রকম ভয় বা আতংক জাগাতে পারেনি। তাদের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। প্রতি বছর এভাবে বহু রমণী স্বামীর হাতে প্রাণ খোয়ায়। ব্যাপারটা এতো সাধারণ হয়ে গেছে যে এতে কোন স্বামীই অবাক হয় না। এটাই যেন স্বাভাবিক।

অন্যদিকে মেয়েরাও সোজাসুজি বলে, এর চেয়ে কাম্য মরণ আর কিছু হতে পারে না। কেন না, ভালবাসার জন্যই যে এ আত্মোৎসর্গ। একে তারা অসীম গৌরবের বলে মনে করে।

এখানকার স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবতই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। তাদের বাড়িঘর, পোষাক পরিচ্ছদও তাই। প্রতিদিন তারা পোষাক বদল করে। প্রত্যহ স্নান করে। অনেক সময়ে দিনে দুবার, সকালে ও সন্ধ্যায়। যখনই তারা প্রাকৃতিক কিছু করে বা স্বামী সহবাস করে প্রত্যেকবারই দেহ ধোয়, তা দিনে একশোবার হলেও।

সচরাচর মেয়েরা খুব কর্মঠ নয়। সুগন্ধি ভেষজ, প্রসাধনী দ্রব্য ও ধুপধুনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। তারা তাদের সারা দেহে কপালে সুগন্ধি চন্দন ও ওই জাতীয় কাঠের কাথ লেপন করে। সারা দিন এক জাতীয় পাতা চিবিয়ে চলে। এই পাতাটির নাম **Bettele** বা পান। খড়ি (চুন) ও **Arrequa** বা সুপারি নামের এক জাতীয় ফল সহযোগে এগুলি তারা খায়। এই সুপারির

মধ্যে কতক এতো কড়া যে লোককে মাতাল করে তোলে, লোকের জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। অথচ খেতে এগুলি সাধারণ কাঠ বা শিকড়ের মতো। গরু ষাঁড় যেমন জাবর কাটে এরাও সেভাবে এগুলি সহ সারাদিন পান চিবিয়ে চলে। এর রস আংশিক গিলে ফেলে তারা, আংশিক পিক কেটে বাইরে ফেলে দেয়। এর ফলে তাদের ঠোঁট ঘন লাল হয়ে যায়। যারা এ রহস্য জানেনা তারা দেখে অবাক হয়। স্নান, ধূপ-ধুনার ব্যবহার, চন্দন লেপনের ও পান খাওয়ার অভ্যাস তারা ভারতীয় পৌত্তলিকদের কাছ থেকে রপ্ত করেছে। সুদূর অতীত কাল থেকে পৌত্তলিকদের মধ্যে এপ্রথা চলে আসছে, এখনো চালু রয়েছে। তারা বলে, পান নাকি দাঁতকে রক্ষা করে, সবল রাখে। পাকস্থলীর পক্ষেও নাকি উপকারী। মুখ থেকে দুর্গন্ধও দূর করে। এগুলি চিবোতে তারা এতবেশি আসক্ত যে যেখানেই যায় এগুলি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। বাঁদীরা পর্যন্ত সব সময় চিবোয় এগুলি। পান না পেলে তাদের প্রাণ যাবার জোগাড় হয়। সারাদিন মেয়েরা কোন কাজ করে না। স্বামীরা কাজকর্মে বেরিয়ে গেলে সর্বক্ষণ জানালার চিকের আড়ালে বসে পান চিবোয় আর রাস্তার লোক চলাচল দেখে চলে। চিকের আড়ালে বসবার দরুন বাইরে থেকে পথচারীরা তাদের দেখতে পায় না। যদি কোন পথচারীর প্রতি সে আকৃষ্ট হয়, তাহাকে দর্শন দিতে চায়। তবে ওই চিক তুলে দর্শন দেয় ও এভাবে অসীম অনুগ্রহ দেখায়। এভাবে দর্শন, দৃষ্টি বিনিময়, দেখা-সাক্ষাৎ থেকেই অনুরাগের পালা আরম্ভ হয়। তারপর দাসী বাঁদীদের সহায়তায় সেই অনুরাগকে সক্রিয় ক'রে তোলে। শুরু হয় এজন্য নানা রকম নোংরা ফন্দীফিকির।

এই পান সুপারী চিবানো ছাড়া তারা প্রতিদিন মুঠোখানেক লবঙ্গ, আদা, গোলমরিচ ও চাচুন্দি নামের এক ধরনের মশলার পিঠা খায়। শেষেরটিতে নানা রকম মশলা ও ওষধি থাকে ও এগুলি তাদের কাম প্রবণতার বৃদ্ধি ঘটায়।

এতেই সন্তুষ্ট নয় তারা। স্বামীদেরও এজন্য হাজার রকম ওষধি খাওয়ায়। তারাও না জেনে সেগুলি খায়। আর এভাবে তাদের সম্ভোগ বাসনা চরিতার্থ করে চলে। তবু এ বাসনা-কামনার প্রকৃতপক্ষে কোন শেষ নেই।

স্নান এবং সাঁতার কাটতেও তারা খুব ভালোবাসে। এবিষয়ে তারা বেশ পারদর্শী। এমন মেয়ে কমই দেখা যাবে যে কিনা আধ মাইল চওড়া নদী অতি সহজে পার হতে পারে না।

তেরো : ভারতীয় পৌত্তলিক সম্প্রদায়

গোয়া দ্বীপ ও শহরে অনেক পৌত্তলিক, মূর ও ইহুদী ও ভারতের কাছে-পিঠের আরো নানা জাতির লোক বাস করে। প্রত্যেক জাতিরই বহু নিজস্ব প্রথা, ধর্মীয় বিধিবিধান রয়েছে ও সেগুলি পালন ক'রে চলে। মূরেরা মুসলমান ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে, ইহুদীরা মোজেস-এর ধর্মের। এছাড়া অনেক পারসিক, আরবীয় ও আবেসীয় রয়েছে। এদের কেউ মুসলমান ধর্মী, কেউ বা খ্রীষ্টান। অনেক আর্মেনীয়ও রয়েছে। এরা খ্রীষ্টান। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষেও অনেক পারসিক, আরবীয়, বেনিয়া, কাম্বেবাসী, গুজরাটী, দক্ষিণী প্রভৃতি আসেন।

মূরেরা শূকরের মাংস ছাড়া আর সব কিছুই খায়। এদের মৃতদেহ ইহুদীদের মতো সমাধি দেয়া হয়। কিন্তু দক্ষিণী, গুজরাটী, কানাড়ী ও অন্যান্য ভারতীয় পৌত্তলিকেরা মারা গেলে তাদের দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। কতক রমণীদেরও তাদের সঙ্গে জীবন্ত পোড়ানো হয়। এ প্রথা অভিজাত ও ব্রাহ্মণদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে রয়েছে। শেষোক্তরা এদের দেব-বিগ্রহ পূজক। পৌত্তলিকদের মধ্যে অনেকে গরু বা মোষের মাংস বাদে আর সব কিছুই খায়। গরুকে তারা পবিত্র রূপে শ্রদ্ধা করে। কিছু লোক আছে যারা জীবন বা রক্ত রয়েছে এরূপ কোন কিছু খায় না। যেমন গুজরাটী ও বেনিয়ারা। এরা পীথাগোরাসের অনুশাসন মেনে চলে (জৈন-ধর্মী বোঝাতে চেয়েছেন)। এদের বেশির ভাগই সূর্য ও চন্দ্রের আরাধনা করে। এসত্ত্বেও তারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তিনিই এ জগৎ সৃষ্টি ও পালন করেন, একথা স্বীকার করেন। মৃত্যুর পর আরো একটি জগৎ আছে ও মানুষ তার ইহলোকের কর্মানুসারে সেখানে শাস্তি বা পুরস্কার পেয়ে থাকে বলে বিশ্বাস করেন। তবে, এদেরও বিগ্রহ রয়েছে। একে তারা প্যাগোডা বলে (বিগ্রহ ও মন্দির দুই অর্থেই লিনসকোটেন স্থানে স্থানে প্যাগোডা শব্দটি ব্যবহার করেছেন)। এগুলি (বিগ্রহ) অতি কুৎসিত আকৃতির। দৈত্যাকার শয়তানের মতোই দেখতে। প্রতিদিন তাদের পূজা করে এরা। তারা বলে থাকে যে এই পবিত্র মানুষেরা এককালে পৃথিবীতে তাদের মধ্যে বাস করতেন। তাদের সম্পর্কে এরা নানা চমকপ্রদ ও অলৌকিক সব ঘটনার কথা বলে থাকে। বলে, এরাই হলেন তাদের ও ভগবানের মধ্যে মধ্যস্থ। এই

মূর্তিগুলির মাধ্যমে শয়তান প্রায়ই তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেয়। তার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য, যাতে সে তাদের কোন অনিষ্ট না করে সেজন্য তারা বিশেষভাবে সম্মান দেখায়, পূজা করে তাকে। কোন কুমারীর বিবাহের বেলা * তাদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। বরের কল্যাণার্থে গান বাজনা সহ বেশ ধূমধাম ক'রে তারা কনেকে মন্দিরে নিয়ে যায়। এই মন্দিরের বিগ্রহটি হাতির দাঁতের তৈরী একটি লিঙ্গ। কনেকে এখানে আনার পর এই বিগ্রহ দিয়ে তার কুমারীত্ব ঘোচানো হয়। এর পর আরো নানা বিদঘুটে কুপ্রথা ও বিধি নিয়ম পালনের পর কনেকে বরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

লিনসকোটেন এখানে যে বিবরণটি সব শেষে দিয়েছেন তা ভ্রমাত্মক। এ জাতীয় কোন প্রথা প্রচলিত নেই। তবে সন্তানহীনাদের ক্ষেত্রে সন্তান কামনায় এ ধরনের প্রক্রিয়া কখনো কখনো অনুসরণ করা হয়।

তাদের মধ্যে আরো একটি প্রথা চালু রয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যে প্রাণীকে দর্শন করে তাকেই সে প্রণাম করে ও সারাদিন তাকে প্রণাম জানিয়ে চলে। তা, সে কোন শূকরই হোক বা অন্য কোন কিছুই হোক।

যদি সকাল বেলা কোথাও যাবার জন্য বার হবার সময়ে কাক দর্শন করে, যা ভারতে প্রচুর রয়েছে, তবে সারাদিন তারা আর বাড়ির বাইরে যায় না। সমগ্র পৃথিবীর লোভ দেখিয়েও এ সিদ্ধান্ত থেকে তাকে টলানো যাবে না। কেননা, একে তারা বিশেষ অশুভ লক্ষণ বলে মনে করে এবং এজন্য সমস্ত দিনটিকে অশুভ বলে গণ্য করে।

অমাবস্যার দিন ও চাঁদের প্রথম আবির্ভাব ক্ষণে অসীম শ্রদ্ধাভরে ভূমিলগ্ন হয়ে প্রণাম জানায় তারা।

এদের কতক লোক আছেন যারা যোগী। আমরা যাদের সন্ন্যাসী বলি এরা অনেকটা সে রকম। এদের তারা ঋষি বা পবিত্র ব্যক্তি রূপে শ্রদ্ধা করে। এরা কৃচ্ছ্র সাধনা সহ বিশেষ সংযমী জীবন যাপন করে। সাধারণ মানুষ এদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী। অনেক ভবিষ্যত বক্তা এবং যাদুকরও আছে এদের মধ্যে। এরা নানারকম ভোজবাজী দেখায় ও সারাদেশ ঘুরে বেড়ায়। কতক লোক আছে যাদের কাছে জীবন্ত সাপ থাকে। সাপকে কী করে বশীভূত করতে হয় সে কৌশল তারা জানে। এগুলিকে ছোট ছোট ঝুড়িতে তারা রেখে দেয়। একটি বিশেষ ধরনের সঙ্গীত যন্ত্র (সাপুড়ের বাঁশী) বাজিয়ে ও কথা বলে তারা এদের নাচ ও খেলা দেখায় এবং রোজগার করে এভাবে। এদের অধিকাংশই

বিষ তৈরীতে বিশেষ দক্ষ। এ দিয়ে তারা নানা আশ্চর্যকর ঘটনা ঘটায়। অনায়াসে একজন অন্যকে বিষ-প্রয়োগ করে। এদের বাসস্থান বা ঘরগুলি খুব ছোট ছোট ও নিচু। ঘরে কোন জানালা নেই, ছাউনী খড়ের। দরজাও অতি নিচু ও সংকীর্ণ। ঢুকতে হলে প্রায় হাঁটু মুড়ে ঢুকতে হয়। ঘরে আসবাবপত্র বলতে ঘাসের মাদুর, এতেই তারা শোয়, এতেই বসে। এদের টেবিল, টেবিল-আচ্ছাদনী ও গামছা ইত্যাদি বলতে কলাপাতা। শুধু তাই নয়, এগুলিই তাদের খাবার থালা। এমনকি মুদি ও খাদ্যদ্রব্যাদির দোকানে এগুলিতেই সব জিনিষ মুড়ে দেয়া হয়। এগুলিকে তারা এমন কায়দায় জোড়ে যে এতে করেই ঘি, তেল ও অন্যান্য তরল পদার্থ দেয়, অন্য সব তো বটেই।

মাটির পাত্রে রান্না করে এরা। মাটিতে গর্ত ক'রে তাতে এই মাটির পাত্রে, একটি কাঠের হাতার সহযোগে ভাত রান্না করা হয়। এরা এতো গরীব যে তারা তুষ-সহ চাল (ধান) কেনে। অনেকে তাদের ঘরের পিছনে, আশেপাশে ধান বোনে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। একটি তামার পাত্র থেকে, (গাড়ু) তার গায়ে লাগান নলের সাহায্যে জলপান করে। এ থেকে তারা আলগাভাবে মুখে জল ঢালে, কখনো ঠোঁট দিয়ে তাকে স্পর্শ করে না। তাদের ঘরে মূল্যবান সামগ্রী বলতে এই একটিই।

নিজেদের ঘরগুলি সাধারণতঃ গোবর দিয়ে লেপে তারা। তাদের মতে এর ফলে নাকি কীট পতঙ্গ রোধ হয়। শারীরিক দিক থেকে তারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। প্রতিদিন তারা সর্বাঙ্গ ধোয় বা স্নান করে। এমনকি মূর বা মুসলমানদের মতো তাদের মল-মূত্র ত্যাগের পরও দেহ ধোয়। শৌচের কাজ বাঁ হাত দিয়ে করে তারা, কেননা ডান হাতটি তারা আহারের জন্য ব্যবহার করে, সেজন্য চামচ ব্যবহার করে না। প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা তাদের যা কিছু ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানাদি পালন করে। প্রত্যেক পাহাড় পর্বতের চূড়ায় ও গুহায় তাদের মন্দির রয়েছে। মূর্তিগুলি অতি বিদঘুটে (devilish) ও কদাকার। পাথর কেটে এই মূর্তি ও মন্দিরগুলি গড়া হয়েছে। প্রত্যেক মন্দিরে জলাধার রয়েছে। তা সব সময়ে জলে পূর্ণ। যে-ই সেখানে যায় আগে পা ধুয়ে নিয়ে তারপর বিগ্রহের কাছে গিয়ে ভূমিলগ্ন হয়ে প্রণাম জানায়। ফল, চাল, ডিম, মুরগি ইত্যাদি নিজের অভিরুচি মতো কিছু না কিছু দেবতার কাছে নিবেদন করে। তারপর তাদের পুরোহিত, ব্রাহ্মণরা এসে সেগুলি নিয়ে যায় এবং নিজেরা খায়। সাধারণ লোক ভাবে দেবতাই এসব খেয়েছে।

সমুদ্র যাত্রার বেলা যাত্রা যাতে শুভ হয় সেজন্য তারা যাত্রার চৌদ্দদিন আগে থাকতেই বহর সাজায়। অতি ধুমধামের সঙ্গে বিগ্রহের কাছে পূজা দেয় ও উৎসব অনুষ্ঠান করে। এ সময় দিনরাত ভেরী ও কাঁসর বাজতে থাকে। ফিরে আসার পরও নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য কৃতজ্ঞতার প্রকাশ স্বরূপ আগের মতো'ই চৌদ্দ দিন পূজা ও অনুষ্ঠানাদি ক'রে চলে। তাদের যে কোন উৎসবে, বিবাহে, সন্তান জন্মে এরকম অনুষ্ঠান করে। এমন কি বীজ বপন, ফসল কাটা প্রভৃতি বছর জুড়ে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষেও।

যে সব পৌত্তলিক গোয়ায় বাস করে তারা অতি ধনী সওদাগর। এদের অনেক জাহাজ চলাচল করে। শহরের একটি সড়কের সবগুলি দোকানই এদের! সব রকমের রেশম-বস্ত্র, সাটিন, দামাস্ক, চীন ও অন্যান্য দেশ থেকে আনা চীনা-মাটির নানা বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার বিক্রী করে তারা। শুধু তাই নয়, ওই সাথে ভেলভেট, সাটিন প্রভৃতি দিয়ে তৈরী পর্তুগাল থেকে আনা রকমারী বস্ত্র সামগ্রীও দালালের মাধ্যমে পাইকারী কেনে ও খুচরা বেচে। এদিকে তারা যেমন কুশলী, তেমনি ধূর্ত। এই একই রাস্তার একদিকে বিভিন্ন রকমের কাপড়, সব স্তরের লোকদের জন্য তৈরী সব ধরনের পোষাক আশাক পাওয়া যায়। আরো একটি রাস্তা আছে যেখানে পৌত্তলিকেরা মেয়েদের সব রকমের পোষাক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী বিক্রী করে। সেখানে হাজার প্রকার শাড়ী, ক্যানভাসের মতো মোটা সুতীকাপড়ের নানা জিনিষ ও বস্তা প্রভৃতি মেলে।

আরেকটি রাস্তা আছে যেখানে কাম্বের বেনিয়ারা বাস করে। এখানে কাম্বে থেকে আনা বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, সব রকমের দামী রত্ন পাথর বিক্রী করে তারা। এসব রত্ন, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতিতে তারা অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে ছেদা করে। এ রাস্তার-ই আরেক দিকে অন্যান্য পৌত্তলিকদের বসবাস রয়েছে। সেখানে তারা খাট, টুল ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের তৈরী আসবাব বেচে। এগুলি অতি চমৎকার ভাবে তৈরী, বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে লাক্ষা দিয়ে রঙ করা। দেখতে খুবই সুন্দর। যে যেরকম রঙ চায় লাক্ষা দিয়ে সেরকম রঙই করে দিতে পারে তারা আসবাবে।

আর একটি রাস্তায় পৌত্তলিক স্বর্ণ ও রৌপ্যকারেরা থাকে। এরা সব রকমের কাজ করতে পারে। এছাড়া অন্য সব কারিগর ও শিল্পীরাও আছে। তাম্রকার, ছুতোর ইত্যাদি ইত্যাদি। এরাও পৌত্তলিক। প্রত্যেকেরই এক একটি রাস্তা বা মহল্লা রয়েছে।

পাইকারী ব্যবসা করে চলেছেন এমন সব বণিকও আছে। নানারকম খাদ্য-

শস্য, চাল, কাঠ এবং বিভিন্ন রকমের ভারতীয় শিল্প ও কৃষি পণ্যাদির কারবার করেন তারা। পৌত্তলিক দালালও আছে কিছু। কেনা বেচার ব্যাপারে বিশেষ ধুরন্ধর এরা, কথাবার্তায় তোয়াজ করে দু পক্ষেরই মন গলিয়ে দেয়।

আনাজ এবং মশলাপাতি বেচার দোকানও আছে পৌত্তলিকদের। ওজন দরে এসব জিনিষ সেখানে খুচরো বেচে তারা। এসব দোকানের জিনিষ কেবল যা তাদের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। যতো রকমের পণ্যদ্রব্য আছে প্রায় সবই সেখানে মেলে। তবে ধূলো-ময়লা আবর্জনা মেশাল। এজন্য সে-সবের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নেই। এই ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ। শহরের সর্বত্র এদের দোকানপাট রয়েছে।

অনেক নাপিতও আছে। এদের কোন দোকান নেই। বাড়ি বাড়ি ঘুরে নামমাত্র মজুরীতে কাজ ক'রে বেড়ায়। চুল কাটে, দাড়ি কামায়, হাত-পায়ের নখ কাটে, দাঁত ও কান পরিষ্কার করে, গা-হাত-পা ডলে দেয়।

চিকিৎসা করার জন্য অনেক পৌত্তলিক চিকিৎসকও গোয়ায় ঘুরে বেড়ান। রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এরা টুপী পরেন পর্তুগীজদের মতো। রাজদূতেরা, কতক ধনী বণিক ও এইসব চিকিৎসকেরা ছাড়া এদের মধ্যে আর কেউ টুপী পরেন না। এরা শুধু দেশীয়দেরই নয়, পর্তুগীজদেরও চিকিৎসা করেন। শাসন কর্তা, আর্ক-বিশপ, সন্ন্যাসীরা এবং ফ্রায়াররা স্বদেশীয় চিকিৎসক অপেক্ষা এদের উপর বেশি আস্থাবান। ফলে, প্রচুর রোজগার করেন তারা, যথেষ্ট মানসম্মান পেয়ে থাকেন।

গোয়াদ্বীপ ও তার নিকটবর্তী এলাকার গ্রামবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই খ্রীষ্টান। তবে পৌত্তলিকদের সঙ্গে তাদের আচার-ব্যবহার, চালচলনের পার্থক্য খুব কম। পৌত্তলিক সংস্কার-গুলিকে বর্জন করে উঠতে পারেনি তারা। কতক রীতি-প্রথা পালন করতে অনুমতিও দেয়া হয়। এর একটি উদ্দেশ্যও রয়েছে। তা হলো, এভাবে ওদের মাধ্যমে অন্য পৌত্তলিকদের খ্রীষ্টান ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা।

প্রত্যেক রাস্তাতেই মুদ্রার ভাঙানি দেবার জন্য পোদ্দার রয়েছে। এদের শরাফ বলা হয়। সকলেই এরা ভারতীয় খ্রীষ্টান। হিসাব ও বিনিময়ের কাজেএরা অতি তৎপর ও অভিজ্ঞ। সব রকম মুদ্রাই এদের জানা। এদের দিয়ে যাচাই না করিয়ে কেউ কোনরকম মুদ্রা নিতে সাহস করে না। চারদিকে অসংখ্য নকল। তা ধরা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু সরাফরা পলক দৃষ্টি বুলিয়েই বলে দিতে পারে সে কথা।

ভারতীয় পৌত্তলিকদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথার চলন রয়েছে। তা হলো, এরা কেউ-ই বংশীয় বৃত্তির পরিবর্তন করতে পারে না এবং একই বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত পরিবারের মধ্যে বিয়ে-থা করতে হয়। তার মানে, দেশ ও জাতির ন্যায় পেশাগুলিকেও তারা বিভিন্ন গোষ্ঠী (বর্ণ)-র জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে। সেই পেশা (বা বর্ণ) অনুসারেই তারা একে অন্যকে অভিহিত করে।

বিয়ের বেলা মেয়েকে তারা কোন রকম গৃহ-সম্পত্তি দেয় না। শুধু যা গয়না ও বিয়ের খরচ দেয়। ছেলেরাই তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

চৌদ্দ : ভারতীয় ঋতু এবং রোগ

এপ্রিল মাসের শেষাশেষি থেকে এখানে শীত ঋতুর আরম্ভ। কাম্বে থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সারা ভারত উপকূলে। পশ্চিমমুখী বায়ু প্রবাহ থেকে এ ঋতুর সূচনা। এ বায়ুপ্রবাহ সাগর থেকে উপকূলের দিকে বয়ে চলে। বজ্র ও বিদ্যুৎ সহ এর আগমন ঘটে। শুরু হয়ে যায় অবিরাম ধারা বর্ষণ। থাকে সেপটেমবর মাস পর্যন্ত। এরপর বিদায় নেয় বজ্র, বিদ্যুৎ ও বর্ষণ। সাঙ্গ হয় শীত ঋতুর। এরকম পরিবেশের জন্য এ সময়ে সাগরে চলাচল সম্ভব হয় না। গ্রীষ্মকালে ফল ধরার ঋতু এলে পূর্বাভিমুখী বায়ুপ্রবাহের শুরু হয়। এ সময়ে রাত বেশ ঠাণ্ডা, এক এক সময় অতি প্রবল। তারপর ফলের মরশুম শেষ হয়। জন্মায় শুধু সেসব জিনিষ যা সারা বছর জুড়ে ফলন্ত।

[লিনসকোটেন এখানে বছরকে দুটি ঋতুতে বিভক্ত করেছেন। এক : শীত ঋতু : যখন ভারত মহাসাগর অঞ্চলে জাহাজ চলাচল করতে পারে না বা এপ্রিল থেকে সেপটেমবর। দুই : গ্রীষ্ম ঋতু—যখন এখানকার সাগরে জাহাজ চলাচল অব্যাহত থাকে বা সেপটেমবর থেকে এপ্রিল।]

শীত ঋতুর সূচনায় নদীতে এনে রাখা হয় জাহাজগুলিকে। সব সাজ-সরঞ্জাম খুলে সরিয়ে নেয়া হয়। মাথার উপর তোলা হয় খড়ের ছাউনি। বর্ষায় জাহাজের কাঠ যাতে পচে না যায় সেজন্যই এ ব্যবস্থা। বন্দরের মুখে এ সময়ে এত্তো বালি জমে যায় যে জাহাজ বা নৌকা কোন কিছুই চলাচল করা সম্ভব নয়। সমুদ্রও উত্তাল হয়ে ওঠে। তার বুক জুড়ে, সারা উপকূল জুড়ে এমন তরঙ্গ কলরোল চলে যে কোন কিছু দেখা বা শোনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। চারি-দিককার পাহাড় ও ডাঙা বয়ে নেমে আসা জলের তোড়ে গোয়া নদীও তখন উত্তাল হয়ে ওঠে। জলের রঙ হয়ে যায় লালচে।

সেপটেমবরে শীত বিদায় নিলে বালি সরে গিয়ে জাহাজ চলাচলের পথ সুগম হয় আবার। তখন শুধু ছোট জাহাজ আর নৌকাই নয়, ১৬০০ টনের বড় বড় পর্তুগীজ জাহাজও দিশারী ছাড়া বন্দর মুখে চলে আসতে পারে। এ পথ তখন বেশ গভীর ও বিপদমুক্ত।

সারা শীতকাল জুড়ে শহরে কোন কর্মব্যস্ততা থাকে না। খেলাধুলা, গল্প-গুজব-আড্ডা ছাড়া কিছুই প্রায় আর করার নেই তখন। মেয়েরা ও মেটিশোরা

এ সময়ে খুব আনন্দে কাটায়। লোকজন দাসদাসীদের নিয়ে তারা খামার বা বাগানবাড়িতে চলে যায়। সেখানে থাকা অসংখ্য পুকুরে স্নান ও সাঁতার কেটে খোসমেজাজে সময় কাটায়। ভারতীয় ফলফলাদির বেশির ভাগই এ সময়ে পাকে।

গ্রীষ্মঋতুর শুরু সেপটেমবর মাসে, শেষ এপ্রিলে। এসময় আকাশ থাকে নির্মল, আবহাওয়া মনোরম। বর্ষা একেবারে হয় না বললেই চলে। এ ঋতুর সূচনা দেখা দিতেই জাহাজগুলিকে বার ক'রে আনা হয়। সাগর যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। রাজার সৈন্যরা উপকূল পাহারা ও বণিকদের নিয়ে যাওয়া আসার কাজ আরম্ভ করে। পূর্ব-বায়ু অতি মনোরম ও স্নিগ্ধভাবে বয়ে চলে।

ঋতু পরিবর্তনের সূচনা পর্বটি একদিক থেকে অবশ্য অতি বিপদজনক কাল। এ সময় নানা ভয়ংকর রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে রাত বারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত সমুদ্রের দিকে বায়ু বয়ে চলে। এ বায়ু সমুদ্রের দশ (ডাচ) মাইলের চেয়ে বেশি ভিতর দিকে যায় না। তারপর, দুপুর একটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বয়ে চলে পশ্চিমা বায়ু। তা সাগর থেকে ভূ-ভাগের দিকে বয়ে চলে। এ বায়ুর নাম দেয়া হয়েছে বিরসন।

ভারত-উপকূলে দিউ থেকে কুমারিকা পর্যন্ত যখন শীতকাল, করমণ্ডল উপকূলে তখন গ্রীষ্ম। এ এক আশ্চর্যকর ঘটনা। কেননা, উভয় উপকূল একই উচ্চতায় অবস্থিত, মধ্যবর্তী দূরত্ব কোথাও ১০ (ডাচ) মাইল, কোথাও বা মাত্র কুড়ি (ডাচ) মাইল। সব থেকে মজার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায় কোচিন থেকে করমণ্ডল উপকূলে সস্ত থমাসে যাবার বেলা। এ সময়ে বল্লগাত (প্রকৃত পক্ষে পালঘাট) পার হবার বেলা দেখা যাবে, পর্বত-মালার একদিকে সূর্যকরোজ্জল মনোরম আবহাওয়া আর অন্য দিকে চলেছে প্রলয় দুর্যোগ। পর্বতমালার একদিকে গ্রীষ্মকাল, অন্যদিকে শীতকাল।

আগেই বলেছি, গোয়া ও সারা ভারতে ঋতু পরিবর্তনের সময়ে নানা রোগ দেখা দেয়। এর মধ্যে একটি হলো মোরদেসিজন (অর্থাৎ কলেরা বা বিসূচিকা)। এটি অতি চলিত রোগ। প্রতি বছর অনেক লোক এ রোগে মারা যায়; একবার এ রোগে আক্রান্ত হলে কদাচিত বাঁচতে দেখা যায়।

রক্ত আমাশা আরেকটি অতি চালু ও ভয়ংকর রোগ। ঠিক আমাদের দেশে প্লেগের মতোই। এরপরও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের টানা জ্বর। এতে ধরলে চার-পাঁচদিনের মধ্যে হয় এপার নয়তো ওপার। এ রোগ অতি চলতি ও ভয়ানক।

রক্তমোক্ষণ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এ রোগের কবল থেকে রক্ষা পাবার জো নেই পর্তুগীজদের। কিন্তু ভারতীয় ও পৌত্তলিকেরা ভেষজ, চন্দন ও নানাপ্রকার মলম ব্যবহার করে নিরাময় লাভ করে।

এসব রোগের ফলে প্রত্যেক বছর বহু পর্তুগীজ মারা যায়। রাজার হাসপাতালই এর সাক্ষ্য দেবে। রোগাক্রান্ত হলে এখানেই তারা ঠাঁই নেয়। প্রতিবছর কম করেও অন্ততঃ পাঁচশোজন এখানে ভর্তি হয় এবং মরার পরই যা বাইরে আসার সুযোগ পায়। এ হাসপাতালে পর্তুগীজরাই শুধু ভর্তি হতে পারে, মানে, যারা সাদা চামড়ার শুধু তারাই। ভারতীয়দের জন্য একটি পৃথক হাসপাতাল আছে। তারা নিজেরাই সেটি গড়েছে।

মলদ্বারে গুটি (Pock) এবং অর্শও এখানকার দুটি চালু রোগ। আর এ রোগের কথা কেউ গোপনও রাখে না এখানে। কেন না, একে তারা অন্য কোন রোগের তুলনায় লজ্জাকর বলে মনে করে না। চীনা শিকড়ের ব্যবহার ক'রে এ রোগ নিরাময় করে তারা।

প্লেগ ভারতে অজানা। আগে কখনো ছিল না। তবে বিষ প্রয়োগ, তুকতাক এসবের ফলে অনেকে স্বাস্থ্য হারায়, কেউ কেউ প্রাণও দেয়। এ দুটি এখানে অতি সাধারণ দৈনিক ক্রিয়াকলাপ।

পনেরো : মুদ্রা ও পরিমাপ

এখানকার প্রধান এবং সর্বাধিক চালু মুদ্রা হলো পরদাওয়ে জেরাফিন। এটি রূপার তৈরী হলেও নীরস মানের রূপার। এ মুদ্রা গোয়াতেই তৈরী হয়। এক দিকে সন্ত সেবাস্তিন ও অন্যদিকে তিন-চারটি তীরের গুচ্ছর প্রতিলিপি রয়েছে। এর মূল্য তিন তিস্তোন (Testone) বা ৩০০ রেইজ পর্তুগাল মুদ্রার সমান। কখনো কখনো দাম সামান্য কিছু ওঠা-পড়া করে।

আরো একরকম মুদ্রামানের চল রয়েছে। একে বলা হয় তংকা (Tanga)। এ নামের কোন মুদ্রার যে সত্যিই চলন রয়েছে তা নয়, তবে কথায় বা হিসাব-পত্তরে চালু আছে। পাঁচ তংকা এক পরদাওয়ে বা জেরাফিনের (খারাপ-মুদ্রা) সমান। এ মুদ্রা দু'রকমের, ভালো আর খারাপ। ভালো চার তংকা খারাপ পাঁচ তংকার সমান। এজন্য কেনাবেচার সময়ে তারা ভালো ও খারাপ মুদ্রা নিয়ে জোর দর কষাকষি চালায়।

এ রকম আরো একটি মুদ্রামানের ব্যবহার চালু রয়েছে। এর নাম ভিস্তিন। এটিও মুদ্রার আকারে চালু নয়। শুধু হিসাবপত্রেই এর অস্তিত্ব। ভালো চার বা খারাপ পাঁচ ভিস্তিন এক তংকার সমান।

সব থেকে কম দামের ও ক্ষুদ্র আকারের মুদ্রা হলো বাজারুকো। এর ভাল ১৫ বা খারাপ ১৮ এক ভিস্তিনের সমান। এছাড়া তিন বাজারুকো আবার দু রেইজ পর্তুগীজ মুদ্রার সমান। এগুলি নীরস টিন ধাতুতে তৈরী গলন যোগ্য মুদ্রা। চলতি মান অনুসারে ৩৭৫ বাজারুকো'তে এক পরদাওয়ে বা জেরাফিন।

পারস্য থেকে আসা এক রকমের মুদ্রা রয়েছে। নাম তার লারিঁ। এটি লম্বাটে ধরনের। অতি ভালো মুদ্রা, কোন রকম খাদ না মিশিয়ে ভালো রূপা দিয়ে তৈরী। এর এক একটির মূল্য ১০৫ থেকে ১০৮ বাজারুকো। কখনো কখনো বিনিময় হার অনুযায়ী কিছু কম বা বেশী।

আরো এক রকমের মুদ্রা চলিত রয়েছে। এর নাম প্যাগোডা। এটি সোনার। দু-তিন প্রকারের আছে। দাম আট তংকার উপর। এগুলি ভারতীয় ও পৌত্তলিক মুদ্রা। এর উপর একটি শয়তানের (দেব-বিগ্রহের) মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে। আর এজন্য এর ওই রকম নাম।

ভেনেসিয়ানডার (সেকুইন) নামের আর একটি স্বর্ণ মুদ্রার চলন রয়েছে। এর কতক ভেনেসীয়, কতক তুর্কী মুদ্রা। এর এক একটি সাধারণতঃ দুই পরদাওয়ে জেরাফিন।

আরো এক প্রকারের স্বর্ণমুদ্রার চল রয়েছে। এর নাম সন্ত থমাস। এই সন্তের মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে তাতে। এর দাম সাত তংকার উপর, কখনো কখনো আট।

এ ছাড়াও রয়েছে রিয়াল-অষ্টক। এ মুদ্রা আসে পর্তুগাল থেকে। এর চলতি নাম রিয়াল পরদাওয়ে। পর্তুগালের অন্য কোন মুদ্রা এখানে চালু নেই। পর্তুগাল থেকে আনার সময় তার দাম ৪৩৬ পর্তুগীজ রেই। পরে, দূরে এসে, আরো চড়ে যায় দাম। কেননা, যারা চীনে যেতে চান তাদের এগুলি দরকার হয়।

গোয়ায় কেনাবেচার সময় আরো একটি মুদ্রামানের হিসাব কষার প্রথা রয়েছে। এটি হল স্বর্ণ পরদাওয়ে। এটিও কিন্তু বাস্তব মুদ্রার আকারে চালু নেই। শুধু ওই যা হিসাবপত্রেই। মূল্যবান রত্ন, মুক্তা, সোনা, রূপা, ঘোড়া ইত্যাদি কেনাবেচার সময় এই স্বর্ণ মুদ্রায় হিসাব কষা হয় সাধারণতঃ। এ সব হিসাবে এক স্বর্ণ পরদাওয়ে ছয় তংকার সমান। অন্যান্য কেনাবেচার সময় যদি তুমি আগে থেকে পরিষ্কার বলে না নাও তবে দর কষাকষিতে যে মূল্য স্থির হবে তাকে সব সময় পরদাওয়ে জেরাফিন বোঝাবে, যার মূল্য প্রত্যেকটি পাঁচ তংকা।

লারিঁ-র পরদাওয়ে নামের একটি মুদ্রার কথাও বিনিময় কালে বলা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে পরদাওয়ের মূল্য পাঁচ লারিঁর সমান।

এখানে যে সব মুদ্রা ও মুদ্রামানের কথা বলা হলো এ গুলির ভিত্তিতেই গোয়াতে কেনা বেচা চলে থাকে। অনেকেই যে এসব মুদ্রা কেনাবেচা ও বিনিময় ক'রে প্রচুর উপার্জন করে সে কথা আগেই বলেছি। পরদাওয়ে জেরাফিনই প্রধান চালু মুদ্রা। এর প্রচুর নকল রয়েছে। এজন্য শহরের প্রত্যেক রাস্তায় কতক ভারতীয় খৃষ্টান থাকে। এদের সরাফ বলা হয়। নকল মুদ্রা চিনতে এদের জুড়ি নেই। মুদ্রার ধারে হাত চালিয়ে বা হাতে তুলে নিয়েই তারা বলে দেবে এটা আসল না নকল। চোখে দেখারও প্রয়োজন হয় না এজন্য তাদের। বিক্রেতাদের আসল-নকল যাচাই করে নিতে সাহায্য করে এরা। মূল ভূ-ভাগের ভারতীয় পৌত্তলিকেরা এ সব নকল মুদ্রা তৈরী করে পর্তুগীজদের ঠকাবার জন্য।

পর্তুগালের মতো গোয়াতেও বিভিন্ন প্রকারের মাপ চালু রয়েছে। কুইন্তার,

আরব ও পাউণ্ড। আরো এক প্রকারের মাপ চালু আছে। একে বলা হয় মাও (মণ)। এক মাও ১২ পাউণ্ডের সমান। এই মাপের সাহায্যে তারা ঘি, মধু, চিনি ও সব রকমের পণ্য দ্রব্যাদি ওজন ক'রে থাকে। গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলাপাতি ওজনের বেলা অন্য একধরনের মাপের ব্যবহার হয়। এর নাম হলো ভার। এটি পর্তুগীজ ৩½ কুইন্তারের সমান। মোদিদা নামের আরো এক প্রকার মাপের ব্যবহার রয়েছে। এটি এক বিঘত উঁচু ও আধ আঙুল চওড়া। এর ২৪ মাপে এক মণ এবং কুড়ি মণে এক কাণ্ডি। এ দিয়ে তারা চাল, অন্যান্য খাদ্য-শস্য ও পণ্যাদি বিক্রয়ার্থে ওজন করে। জাহাজেও এই মাপ অনুসারে ভাড়া লেখা হয়। জাহাজের বহন ক্ষমতাও কাণ্ডি বা ভারের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। অনেকে আবার ফারদো পরিমাপেও চাল বিক্রী করে। এই চাল খড়ে মুড়ে গোলাকার বাণ্ডিল আকারে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনা হয়। এক ফারদো সাধারণতঃ সাড়ে তিন মণের সমান। এ চাল অন্য ভাবে আসা চালের চেয়ে সরস মানের। নাম জিরশাল। এ জাতের চাল সব থেকে সরস, সব থেকে দামী। এর চেয়ে সামান্য কম দামের ও নীরস মানের আর এক প্রকার চাল আছে। তার নাম শন্বাশাল। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন মানের চাল রয়েছে, যার দাম অন্যান্যর চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম, এগুলিকে বলা হয় বাত (ভাত)। এগুলিই এখানকার মূল অধিবাসী কানাড়ীদের দৈনন্দিন সাধারণ খাদ্য। অন্যান্য গরীব ও সাধারণ শ্রেণীর লোকেরাও এই-ই খায়। ঘুঘু ও মুরগীদেরও এগুলিই খাওয়ানো হয় যবের বদলে।

ভারতের অভ্যন্তর এলাকায় নানা স্থানে নানারকম মুদ্রা চালু। সেগুলি সাধারণতঃ তাদের মধ্যেই চলে। যেমন ধরো বাঙলায় বাজারুকোর বদলে আমেন-দোয়া বা বাদাম। এ দিয়ে তারা তাদের জীবিকা অর্জন করে, কেনা বেচা চালায়। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এ রকম বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা চালু রয়েছে।

ষোল ঃ ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও তাদের রীতি-প্রথা

ভারতের পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই হলো শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত বর্ণের লোক। রাজসভায় তারাই সব সময়ে তত্ত্বাবধায়ক, নায়েব, রাজদূত প্রভৃতি মুখ্য ও দায়িত্বশীল পদগুলিতে অধিষ্ঠিত হয়। দেবমন্দির বা তার শয়তান চেহারার বিগ্রহগুলিরও সেবায়েৎ তারাই। লোক সমাজে তারাই হলো সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ। তাদের সম্মতি ও পরামর্শ ছাড়া রাজা কোন কাজই করেন না।

কাঁধের উপর থেকে আড়াআড়ি ভাবে শরীর ঘিরে ঝোলানো সূতার বন্ধনী (উপবীত) দেখে তাদের চেনা যায়। তিন চার গাছা সূতা একত্র ক'রে এটি তৈরী। সবসময় এটি পরে থাকে, জীবন গেলেও কখনো একে ত্যাগ করে না। তাদের ধর্মীয় অনুশাসনই সেরকম।

পোষাক বলতে শুধু কোমরেই যা এক প্রস্থ কাপড় জড়ানো। এ দিয়ে গোপনাঙ্গ ঢাকা দেয়া ছাড়া পুরো দেহ-ই তাদের উদোম। বিদেশে বা বাইরে গেলে কখনো সখনো তারা একখণ্ড মিহি সূতী কাপড়ের কাবা আলতোভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখে। বেনিয়া, গুজরাটী বা দক্ষিণীদের মতো এটি প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলে থাকে। মাথায় দু-তিন ফেরতা দিয়ে একটি সাদা কাপড় জড়ানো। এই রীতিতেই তারা মাথার চুল ঢাকে। জীবনে কখনো চুল কাটে না তারা। লম্বা হয়ে ঝুলে থাকে বা মেয়েদের মতো চূড়া ক'রে বাঁধে। অধিকাংশের কানেই সোনার বলয় ঝোলানো। বেশির ভাগ ভারতীয়ের কানেই তাই। যার প্রাণ আছে এমন কোন কিছুই তারা খায় না। শাকপাতা, চাল ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। কোন কারণেই, এমন কি অসুস্থ হলেও রক্ত মোক্ষণ করে না। ভেষজ, মলম ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে বা গায়ে চন্দন অথবা ওই জাতীয় সুগন্ধি লেপন ক'রে নিরাময় হয়।

গোয়া ও সমুদ্র উপকূল এলাকায় অনেক ব্রাহ্মণ বাস করে। এরা সাধারণতঃ মশলা ও ওষধি-উপাদান বিক্রী ক'রে থাকে। তবে এগুলি মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, ধুলোময়লায় ভরা। লেখালেখি হিসাবপত্রের কাজেও এরা পুরো চৌকস। অন্যান্য সব সরল সাধাসিধে ভারতীয়দের এর সাহায্যে তারা যেমন খুশী বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে, বোকা বানিয়ে দিতে পারে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ মানুষেরা এদের ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে মনে করে। প্রাতঃকালে বা রাস্তায় বার হবার কালে প্রথম যে বস্তুকে দর্শন করে তাকেই প্রণাম জানায়। মেয়েরা একখানা কাপড়ের একভাগ দিয়ে (বুক ও) মাথা এবং অন্য ভাগ দিয়ে নিম্নাংগ ঢাকে। শরীরের বাদবাকি অংশ থাকে অনাবৃত। তারা নাকে নোলক, পায়ে, পায়ের আঙুলে, গলায়, বাহুতে নানা রকম গয়না পরে। হাতে থাকে সাত-আট গাছা ক'রে চুড়ি। ভারতীয় নারীদের প্রত্যেকেরই এ রকম অভ্যাস। যারা ধনী ঘরের তারা রূপা বা সোনার, যারা গরিব তারা পরে কাচের চুড়ি। মেয়েদের বয়স যখন সাত, ছেলেদের নয়, ওই বয়সেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। তবে মেয়েরা সন্তান হবার বয়সে পা না দেয়া পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে বাস করে না।*

কোন ব্রাহ্মণ মারা গেলে আত্মীয় পরিজনেরা তার সৎকার ব্যবস্থা করে। মাটিতে একটি গর্ত খোঁড়া হয় এজন্য। কাঠ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী জড়ো করা হয় তাতে। মৃত ব্যক্তি বিশিষ্ট কেউ হলে চন্দন কাঠ ও আরো অন্য সব সুগন্ধি দেয়া হয় তার মধ্যে। এছাড়া, চাল অন্যান্য শস্য এবং প্রচুর তেল ঢালা হয় আগুনকে জোরদার করার জন্যে। তারপর মৃত ব্রাহ্মণকে এনে শোয়ানো হয় তার উপরে। তারপর আসে ওই ব্রাহ্মণের স্ত্রী। গান বাজনা ও মৃত ব্রাহ্মণের স্তুতিগান করতে করতে নিকট আত্মীয়-পরিজনেরা তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে ও জীবন আহুতি দিয়ে স্বামীর অনুগমনের জন্য উৎসাহিত ক'রে চলে। সে তখন তার গহনাগাটি খুলে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তা বিলিয়ে দেয়। তারপর প্রফুল্ল মুখে হাসতে হাসতে ঝাঁপ দেয় সেই আগুনে। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের উপর আরো কাঠ চাপিয়ে দেয়া হয়, তেল ঢালা হতে থাকে, যাতে সে তাড়াতাড়ি মারা পড়ে, দুজনের দেহই চটপট পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যদি কোন নারী পুড়ে মরতে অসম্মত হয়, যা অবশ্য কদাচিৎ ঘটে, তবে মাথার চুল ছেঁটে ফেলা হয়। যতকাল সে বেঁচে থাকে গয়নাগাটি পরতে পারে না। সকলে তাকে ঘৃণার চোখে দেখে, অসতী বলে মনে করে।

এ দেশের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাতদের মধ্যে, এছাড়া কতক বণিকদের মধ্যেও এরূপ (স্ত্রীকে) পোড়ানোর প্রথা রয়েছে। তবে, সাধারণ ভাবে, তাদের মধ্যে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির দেহ-ই পুড়িয়ে ফেলা হয়। এবং মেয়েরা চুল ছেঁটে, গহনা-গাটি ত্যাগ ক'রে বিধবার জীবন যাপন করে।

বছরের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দিনে ব্রাহ্মণেরা উপবাস ক'রে কাটায়।

অতি কঠোর ভাবে তারা এ উপবাস পালন করে, এ সময়ে কোন কিছুই তারা খায় না সারাদিন। কখনো তিন-চার দিন এভাবে থাকে। যে সব দেব-মন্দির ও দেব-বিগ্রহ আছে এখানে, এরাই সে সবের সেবায়েৎ। ওই সব বিগ্রহ সম্পর্কে তারা নানারকম আশ্চর্য আশ্চর্য কাহিনী, অলৌকিক সব ঘটনার কথা শোনায়।

বিশ্বজগতের সবার উপরে যে অদ্বিতীয় ভগবান রয়েছেন, সব কিছুই যে তারই অধীন এ মতধারাতেও তারা বিশ্বাসী। মানুষের আত্মা যে অবিনাশী, মৃত্যুর পর তারা যে এই মরলোক থেকে অন্য লোকে প্রস্থান করে একথাও তারা মানে। তারা মনে করে পশু ও মানুষ সকলেই নিজ নিজ কর্মানুসারে পরলোকে ফলভোগ ক'রে থাকে অর্থাৎ পীথাগোরাসের মতধারাতেই বিশ্বাসী তারা, তারই অনুগামী এরা সকলে।

সতেরো ঃ গুজরাটী ও বেনিয়া

গুজরাটী ও বেনিয়ারা কাম্বে রাজ্যের অধিবাসী। তবে তাদের অনেকেই গোয়া, দিউ, চউল, কোচিন এবং ভারতের অন্যান্য এলাকায় বসবাস করে। ব্যবসায়ের পেশা, পণ্যসামগ্রী নিয়ে দেশ-দেশান্তরে গমনাগমনই এর প্রধান কারণ। খাদ্য-শস্য, তুলা, বস্ত্র, নীল, চাল ইত্যাদি সব রকম পণ্য নিয়ে জাহাজে ক'রেও বাণিজ্য ক'রে বেড়ায় তারা। বিশেষ ক'রে দামী দামী রত্ন পাথরের ব্যবসা তো আছেই। এ বিষয়ে তাদের বিরাট দক্ষতা রয়েছে। লেখালেখি, হিসাব পত্র রাখার ক্ষেত্রেও এরা অতি নিপুণ ও কুশলী। এ ব্যাপারে তারা যে শুধু ভারতীয় ও প্রতিবেশী অন্যান্য সব জাতিদের উপরে তাই নয়, পর্তুগীজদেরও হার মানায়। এর ফলে তারা অনেক বাড়তি সুযোগ ভোগ করে। পণ্য-সামগ্রী বেচা-কেনায় যেমন তারা অতি কুশলী তেমনি আবার সব সময়েই লোক ঠকাতে তৎপর।

প্রাণ আছে এমন কোন কিছুই এরা খায় না। যতো তুচ্ছ, যতো ক্ষুদে প্রাণীই হোক না কেন তাকে তারা কখনো হত্যা করেনা, কোন কিছুর বিনিময়েই নয়। প্রত্যেক জীবের-ই আত্মা রয়েছে বলে তাদের বিশ্বাস। এদের মতে জীব মাত্রেই মরণ-শীল এবং মানুষের পরই অন্যান্য জীবের স্থান। এক কথায় পীথাগোরাসের মতবাদেরই অনুগামী এরা। খ্রীষ্টান বা পর্তুগীজেরা যে সব প্রাণীকে বশ করার জন্য নিয়ে আসে বা পোষে, এরা কখনো কখনো তাদের কিনে নিয়ে ছেড়ে দেয়। কাম্বের রাজপথে বা বনাঞ্চলের স্থানে স্থানে পশু-পাখিদের জন্য এরা জলের পাত্র রাখে, নানা রকম খাদ্য-শস্য ছড়িয়ে দেয়। পশু-পাখিদের চিকিৎসার জন্য কাম্বের সর্বত্র হাসপাতালও গড়েছে এরা।

মূলা, পেঁয়াজ এধরনের লাল রঙা কোন আনাজ এরা খায় না। ডিমও না। মদ খায় না, ভিনিগার ব্যবহার করে না। শুধু যা জলই খায়। যারা তাদের স্বজাতি নয় তাদের অন্নজল গ্রহণেরও বিরোধী তারা। না খেয়ে মরবে তাও সই তবু তাদের সঙ্গে খাবে না। প্রায়ই পর্তুগীজদের জাহাজে ক'রে পর্তুগীজদের সঙ্গে তারা গোয়া থেকে কোচিন পণ্যাদি কেনা-বেচা করতে যায়। এসময়ে তারা আলাদা ভাবে নিজেদের জন্য জল ও খাদ্য সঙ্গে নেয়। যদি কোন কারণে তা ফুরিয়ে যায় তবে খ্রীষ্টানদের অন্নজল স্পর্শ করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণকেই তারা

শ্রেয়ঃ মনে করে। গোয়া থেকে কোচিন যাবার বেলা এরকম একটি ঘটনা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল।

এদের গায়ের রঙ ব্রাহ্মণদের মতোই। কখনো কখনো আরো হলুদ। মেয়েদের অনেকে পর্তুগীজ মেয়েদের চেয়েও ফরসা ও সুন্দরী। শারীরিক দিক থেকে সকলে য়ুরোপীয়দের মতোই সুগঠিত, পার্থক্য যা শুধু গায়ের রঙে। দেহে পোষাক বলতে একমাত্র যা কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত লম্বা ঘাঘরা। ভিতরে আর কোন কিছু পরেনা। মিহি সাদা কাপড় নিয়ে এটি তৈরী। বাঁধন দেয়া হয়ে থাকে পাশদিক থেকে। পায়ের জুতো লাল রঙা। তার মাথার দিকটা সুঁচালো ও বাঁকানো। তুর্কীদের মতো দাড়ি কামায়, তবে গোঁফ রাখে। তিন-চার ফেরতা দিয়ে মাথায় সাদা কাপড় জড়ায় ব্রাহ্মণদের মতো। কপালে আঁকে সাদা চন্দনের তিলক। এটি তাদের একটি প্রাত্যহিক কর্ম। ধর্মীয় বিধি হিসাবে ব্রাহ্মণেরাও এটি করে। প্রতিদিন এরা দেহে চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি লেপন করে। অন্যান্য ভারতীয়দের মতো এদের মধ্যেও এর ব্যবহার প্রচুর।

এদের মেয়েরা: ব্রাহ্মণ মেয়েদের মতোই পোষাক পরে। মুসলমান ও অন্যান্য ভারতীয়দের মতোই নিচে বসে খায়। বাড়িতে ও সমাবেশে তারা নিচে মাদুর বা গালিচা পেতে তার উপর বসে। ঘরে ঢোকার আগে সর্বদা জুতো খুলে দরজার বাইরে রাখে ও খালি পায়ে ভেতরে ঢোকে। এছাড়া আরো হাজার রকমের পৌত্তলিক রীতিপ্রথার চালচলন এদের মধ্যে বর্তমান।

আঠারো ঃ কানাড়ী ও দক্ষিণী

কানাড়ী ও দক্ষিণীরা দক্ষিণ দেশগুলির (দাক্ষিণাত্যের) বাসিন্দা। এ অঞ্চলকে সাধারণতঃ বল্লগাতি বলা হয়। গোয়ার পিছন দিকে এ অঞ্চল বিস্তৃত। এদের অনেকে গোয়ায় থাকে। সেখানে এদের বাড়িঘর, দোকানপাট রয়েছে। সব রকম কাপড়ের ব্যবসা করে এরা। ভেলভেট, রেশম, সাটিন, দামাস্ক। পাইকারী হারে পর্তুগীজদের কাছ থেকে এগুলি কেনে। এ ছাড়া আছে সব রকমের সূতী বস্ত্র, চীনামাটির সামগ্রী, এবং অন্যান্য সব রকম শিল্পজ ও কৃষিজ পণ্য দ্রব্যের ব্যবসা। এ গুলি আসে কাম্বে, চীন, বাঙলা প্রভৃতি দেশ থেকে।

মূল ভূ-ভাগ থেকেও বিভিন্ন রকম খাদ্যশস্য ও নানা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে আসে তারা গোয়ায়। এদের নিজেদের জাহাজ আছে। সেসব দেশীয় জাহাজে ক'রেই তারা তাদের মালপত্র নিয়ে কাম্বে, সিন্ধু ও লোহিত সাগর অঞ্চলে আনাগোনা করে। এদের অনেকে সোনা ও রূপার কাজ করে। তামার কাজও করে অনেকে। এ ব্যাপারে রীতিমতো কুশলী তারা। এছাড়া আরো নানারকম হাতের কাজে, পেশায় নিযুক্ত রয়েছে। যেমন ধরো—নাপিত, ছুতোর, চিকিৎসক ইত্যাদি। এদের অনেকেই গোয়ায় থাকে। গোয়ায় এদের সংখ্যা পর্তুগীজ, মেষ্টিশো ও খ্রীষ্টানদের মতোই বিরাট।

এদের পোষাক-আশাক গুজরাটী ও বেনিয়াদের মতোই। শুধু জুতোজোড়াই যা অন্যরকম। এ জুতোর আঙুলের দিক খোলা, সাবেক ধরনের এবং উপরের দিক দিয়ে বাঁধা হয়। এগুলিকে তারা অলপরকা (শণ বা খাসের চটি) বলে। এরা দাড়ি রাখে। চুলও লম্বা, দেখলে মনে হবে বুঝি কাটে না। বেনিয়া ও ব্রাহ্মণদের মতো উপরের দিকে তুলে চুড়ো বেঁধে রাখে। গায়ের রঙ আর শরীরের গড়নের দিক থেকেও তাদের মতোই। গরু, শূকর, মেষের মাংস ও মাছ বাদে আর সব কিছুই খায়। ষাঁড়, গরু বা মোষকে পবিত্র বলে মনে করে। এদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই এগুলি আছে। এরা তাদের সঙ্গে পরম ভক্তি ভরে অতি সযত্ন ব্যবহার করে, নিজেরা যা খায় তাই তাদের খেতে দেয়। যখন তারা মলত্যাগ করে তখন এরা লেজের নিচে হাত পেতে থাকে ও তা নিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। রাত্রে একই বাড়িতে তাদের সঙ্গে বাস করে। এককথায় বলতে গেলে এদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন তারাও বুদ্ধিমান,

যুক্তিবাদী প্রাণী। এরা মনে করে যে ওদের সঙ্গে এরকম আচরণের ফলে খুব পুণ্য অর্জন করছেন নিজেরা। চালচলন আচার ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস ও ধর্মীয় রীতিনীতির দিক থেকে এরা ব্রাহ্মণ, গুজরাটী ও বেনিয়াদের মতোই একেবারে। সাত বা আট বছরের বেলাই এদের বিয়ে পাকা হয়ে যায়। এগারো বা বারো বছরের বেলা বিয়ে হয় ও একত্র বাস করে। বিয়ের চৌদ্দদিন আগে কাড়ানাকড়া বাজিয়ে বাজী পুড়িয়ে উৎসব শুরু হয়ে যায়। দিনরাত এ উৎসব ও গানবাজনা চলে। দেখে শুনে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কানে তালা লাগার জোগাড় হয়। বিয়ের দিন দু-পক্ষের বন্ধু-বান্ধব আত্মী-স্বজন একত্রিত হয়, বাড়িতে মাটির উপরে বসে। আগুন জ্বালানো হয়। কতক শব্দ (মন্ত্র) উচ্চারণ করতে করতে (বর ও কনে) সাত বার সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ করে ও এভাবে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। কনেকে তারা গৃহ-সম্পত্তি কিছু দেয় না, শুধু যা চুড়ি, কানের দুল এজাতীয় অল্পমূল্যের কতক বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দেয়। স্বামী-দের এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কেননা, মেয়েরা এখানে কোন উত্তরাধিকার লাভ করে না, ছেলেরাই সব পায়। মেয়ে ও বোনদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রতিপালন ক'রে থাকে।

মারা যাবার পর এদের দেহ অন্যান্যদের মতোই পুড়িয়ে ফেলা হয়। কারো কারো স্ত্রীরাও সহমরণে যায়। তবে ব্রাহ্মণদের মতো অতো বিরাট সংখ্যায় নয়।

প্রত্যেকেই তারা পিতা বা বংশের জীবিকা অনুসরণ করে। স্ববর্ণের মধ্যেই বিয়ে থা হয়। ব্রাহ্মণদের মতো তাদেরও কতক নির্দিষ্ট উপবাসের দিন ও পর্ব পার্বণাদি রয়েছে। কেননা, ব্রাহ্মণরাই এদের আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় দিকদর্শক, এরা তাদেরই অনুগামী। বরদেজ, সলসেত্তি ও গোয়াদ্বীপে রাজার খাজনা, বাণিজ্য-শুল্কাদি এরাই আদায় করে। এ ব্যাপারে আইন-আদালতে ঝঞ্ঝাট পোয়াতেও এরা পেশাদার আইনজ্ঞের চেয়ে বেশি দক্ষ। যখন তাদের কাছ থেকে কোনরকম সাক্ষ্য নেয়া হয় তখন যেখানে তারা সাক্ষ্য দেবার জন্য দাঁড়ায় তার চারদিকে ছাই দিয়ে একটি গোলাকার গণ্ডী এঁকে দেয়া হয়। সাক্ষীর খোলা মাথার উপরও কতক ছাই রাখা হয়। এক হাত সে তার মাথার উপর রাখে অন্য হাতটি বুকের উপর। তারপর নিজের দেবতার নামে শপথ নিয়ে সাক্ষ্য দেয়।

উনিশ ঃ কানাড়ীজন ও কোরাম্বীজন

কানাড়ীজন ও কোরাম্বীজন (কুণাম্বী বা কুণবী) হলো চাষীসম্প্রদায়ের লোক। চাষবাস, মাছধরা প্রভৃতি নানারকম পরিশ্রমের কাজ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে এরা। নারকেল গাছের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণও করে। কতক আবার ধোবার কাজ করে শুধু। এটি এদেশে একটি পৃথক জীবিকা। এদের মইনাত্তো বলা হয়। কতক আবার পত্রবাহকের কাজ করে। এদের বলা হয় পতেমারী। শীতকালে যখন কেউ সাগরপথে যাতায়াত করতে পারে না তখন এরা স্থলপথে পত্র নিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে।

এই কানাড়ীজন ও কোরাম্বীজনেরা সারা ভারতবর্ষ মধ্যে সব থেকে নিচু বর্ণের ও গরিব শ্রেণীর লোক। অতি দীনহীন ভাবে আধপেটা খেয়ে জীবন-ধারণ করে। গরু, ষাঁড়, মোষ, শূকর ও মুরগির মাংস বাদ দিয়ে আর সব কিছুই খায় তারা। ধর্মের দিক থেকে দক্ষিণী ও কানাড়ীদের মতো। একখণ্ড কাপড় দিয়ে গোপনাঙ্গ আবৃত করা ছাড়া এরা একরকম নগ্নই থাকে। মেয়েদের পরণে হাঁটু অবধি কাপড়, এরই অন্য প্রান্ত কাঁধের উপর ফেলা। যার ফলে বুকের আধা ঢাকা পড়ে মাত্র। গায়ের রঙ কালচে ধরনের বা ঘন বাদামী। অনেকেই খ্রীষ্টান ধর্ম নিয়েছে। গোয়ার চারিদিককার সমুদ্রকূল অঞ্চলে এরা বসবাস করে। কেন না সমুদ্র ও নদী উপকূলেই নারকেল গাছ জন্মায়। চাল জন্মায় নিচু জমিতে, শীতকালে যে সব জমি জলে ডোবা থাকে সেখানে। আর এসবের উপর নির্ভর করেই কানাড়ীজনেরা জীবন-নির্বাহ করে। ভিতর অঞ্চল থেকে মুরগি, ফল, দুধ, ডিম, এবং আরো নানা জিনিষপত্র এরা বিক্রি করার জন্য শহরে নিয়ে আসে।

ছোট ছোট খড়ের ছাউনি দেয়া ঘরে বাস করে এরা। ঘরের দরজা এতো নিচু যে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে যাওয়া-আসা করতে হয়। ঘরকন্নার উপকরণ বলতে মাটিতে বিছিয়ে শোবার জন্য একটি মাদুর, আর রান্না করার জন্য মেঝেতে একটি গর্ত ও একটি কি দুটি (মাটির) পাত্র। যে ভাবে তারা তাদের বিরাট

পরিবারের ভরণপোষণ চালায় তা সত্যিই থ হয়ে দেখার মতো। বেশির ভাগ পরিবারই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েতে ভরপুর। পুরো ন্যাংটা অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায় সব। সাত আট বছর হবার পর গোপনাঙ্গ ঢাকতে শুরু করে। স্বামীরা স্ত্রীর প্রসব সময়েও মাঠের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে, স্ত্রীরা ঘরে একা একা প্রসব করে। এরকম একটি ঘটনা একবার নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার।

জনকয়েক সঙ্গীকে নিয়ে একদিন আমি অনেক কৃষিক্ষেত পার হয়ে কানাড়ী-দের একটি গাঁয়ে পৌঁছলাম। খুব জলতেষ্টা পেতে হামাগুড়ি দিয়ে একটি ঘরের মধ্যে ঢুকে একটু জল চাইলাম। দেখি, ঘরের মধ্যে একা একজন স্ত্রীলোক। তার পরনের কাপড় কোমরে আঁট ক'রে জড়ানো। সামনে এলটি জলভরা কাঠের পাত্র, যাকে পর্তুগীজরা গামলা (Gamello) বলে। তাতে একটি ক্ষুদে শিশুকে দাঁড় করিয়ে তাকে ধোয়ামোছা করছে। ধুয়েমুছে তাকে সে ন্যাংটা অবস্থাতেই নিচে একটি কলাপাতার উপর শুইয়ে দিলে। এ কাজ করতে করতেই সে আমাকে জলের জন্য একটুখানি অপেক্ষা করতে বললে। কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন ক'রে আমি জানতে পেলাম, এ শিশুটিকে সে এইমাত্র অন্য কারো সাহায্য না নিয়ে একা একা প্রসব করেছে। একথা শোনার পর তার হাত থেকে জল খাবার ইচ্ছা উবে গেল আমার। অন্য এক বাড়ি চলে গেলাম। একটু পরেই ফেরার পথে দেখি স্ত্রীলোকটি ছেলেকে কোলে নিয়ে বাড়ির উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন এটা কোন ঘটনাই নয় তার কাছে। শিশুটি তেমনি ন্যাংটা, পুরো উদোম। একমাত্র ঠাণ্ডা জলে ধোয়ামোছা করা ছাড়া আর কোন যত্নই নেয়া হয়নি তার।

এভাবেই তারা বেড়ে ওঠে, বড় হয় নিজের ধ্যানধারণা প্রাকৃতিক তাড়না ও প্রবণতা মতো। এদেশে যা সম্ভবপর সেই মতো কাজকর্ম ক'রে চলে। এভাবে এরা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, এমন কি একশ বছরও। আর, একালের মধ্যে কখনো এরা মাথাধরা, দাঁতের ব্যথায় ভোগেনা, দাঁতও পড়েনা। মাথায় এরা একগোছা ক'রে চুল রাখে। এই গোছাটি লম্বা হয়ে বেড়ে চলে। আশে-পাশের অন্য সব চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে দেয়। জলে সাঁতার কাটতে কি ডুব দিতেও এদের জুড়ি নেই। অলমাদিয়া নামের এক প্রকার ছোট নৌকায় ক'রে এরা নদীতে চলাচল ক'রে বেড়ায়। এ নৌকার কতক একখণ্ড কাঠ কুরে কুরে তৈরী। এবং এতো সরু যে অতি কষ্টে একজন লোক বসতে পারে। নদীপার হবার

কালে প্রায়ই দু-তিন বার উলটে যায় এগুলি। এ সময় জলে ঝাঁপ দিয়ে নৌকা সোজা ক'রে নেয়, আবার তাতে চাপে।

এরা এতো গরিব যে একটি পেনির জন্য চাবুকের মার সহ্য করতেও দ্বিধা করে না। এতো কম খাওয়া জোটে যে মনে হবে এরা বুঝি শুধু হাওয়া খেয়ে বেঁচে আছে। ফলে এদের অনেকেই টিঙটিঙে পাতলা ও রোগা। গায়ের জোর খুবই কম, ভীতুও অসম্ভব। এর সুযোগ নিয়ে পর্তুগীজরা এ'দের উপর নানাভাবে পীড়ন ও অত্যাচার চালায়, কুকুর বেড়ালের মতো আচরণ করে এদের প্রতি।

বিয়ে ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে এদের বিধিপ্রথা দক্ষিণী ও কানাড়ীদের মতোই। ধর্ম ও উৎসব অনুষ্ঠানের দিক থেকেও তাই।

কুড়ি ঃ আরবীয় ও আবেসিনীয়

ভারতবর্ষে অনেক আরবীয় ও আবেসিনীয় আছে। আরবীয়গণ মুসলমান ধর্মের অনুগামী। আবেসিনীয়দের মধ্যে কতক মুসলমান, কতক খ্রীষ্টান। এরা প্রেষ্টার জনের রাজ্যের লোক। এ ভূ-ভাগ ইথিওপীয়ার মোজাম্বিকের পিছনদিকে লোহিত সাগর ও মিশরের নীলনদ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। মুর ও মুসলমানদের সঙ্গে বাণিজ্যিক মেলামেশা ও যাতায়াতের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক থেকে অনেকেই এদের ওই ধর্মের দিকে ঝুঁকেছে। এদের অনেকেই ভারতে বন্দী ও ক্রীতদাস রূপে রয়েছে। মেয়ে পুরুষ দুই-ই। ইথিওপীয়া থেকে এদের আনা হয়েছে ও অন্যান্য প্রাচ্য জাতির লোকদের মতো বিক্রী ক'রে দেয়া হয়েছে। খ্রীষ্টান আবেসিনীয়দের মুখে ক্রুশের মতো দেখতে চারটে পোড়া দাগ রয়েছে। একটি নাকের উপর দিকে কপালের মাঝে, ঠিক দুচোখের মাঝখানে। একটি ক'রে প্রত্যেক গালে, চোখ ও কানের মাঝামাঝি। আর একটি নিচের দিককার ঠোঁটের তলে, থুতনীতে। এই-ই তাদের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার চিহ্ন।

ভারতে বসবাসকারী আরবীয় ও আবেসিনীয়দের মধ্যে যারা স্বাধীন তারা নাবিকের কাজ করে। যে সব বণিক জাহাজ নিয়ে গোয়া থেকে চীন, জাপান, বাঙলা, মালাক্কা, হরমুজ ও অন্যান্য প্রাচ্য উপকূলে যাতায়াত করে তারা এদের সঙ্গে নেয়। কেননা নাবিকের কাজ করার জন্য এদের ছাড়া অন্য কোন লোক পাওয়া যায় না। পর্তুগীজরা অবশ্য এদেশে আসার বেলা অনেকেই নাবিকের কাজ করে। কিন্তু ভারতে আসার পর সে-কাজ আর করতে চায় না। তখন এ ধরনের কাজকে তারা অসম্মানজনক বলে মনে করে। ভারতে তাদের যে রকম বিরাট ভাবমূর্তি, কর্তৃত্ব ও সম্মান রয়েছে বলে তারা মনে করে এরূপ কাজের ফলে তা নষ্ট হয়ে যাবে বলেই তাদের ধারণা। তাই তখন আর উঁচুপদ ছাড়া জাহাজের কাজ করতে যায় না। জাহাজের ক্যাপটেনরা তখন তাদের পাইলট ও চিফ বোটাসন্নি (Botasonnes) নামে অভিহিত করে থাকেন। এর চেয়ে কোন নিচু পদে কাজ করলে তা পর্তুগীজদের পক্ষে বিরাট কলঙ্ক ও অপমানের কারণ হয়ে ওঠে, স্থানীয় পর্তুগীজরা তা আদপে সহ্য করে না।

আবেসিনীয় ও আরবীয়রা খুবই অল্প পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করে, নিম্নতম সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকে। অনেক সময় তাদের প্রতি যে রকম মারধোর ও আচরণ করা হয় তা ক্রীতদাসদের সাথেও করা হয় না। একমাত্র কুকুরের প্রতি আচরণের সঙ্গেই তুলনা করা চলে এর। এরাও অতি ধৈর্যের সঙ্গে এসব সহ্য করে, কোন রকম বাদ-প্রতিবাদ করে না। সাধারণতঃ স্ত্রীপুত্র-দের সঙ্গে নিয়েই এরা জাহাজে থাকে, নিজেরাই নিজেদের রান্নাবান্না করে। খাদ্য বলতে রান্নাকরা ভাত ও তারই মধ্যে ফেলে দেয়া নোনতা মাছ। জাহাজ শুধু গ্রীষ্মকালেই সাগরে পাড়ি দেয়। ওই সময়ে সমুদ্র থাকে শান্ত, আবহাওয়া নির্মল। এজন্যেই স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে সাগরে যায় এরা।

প্রত্যেক জাহাজে সাধারণতঃ একজন বা দু'জন ক'রে পর্তুগীজ থাকেন। ক্যাপটেন, মাষ্টার বা পাইলট। প্রধান নাবিকের (Boteson) দায়িত্বে থাকে সাধারণতঃ কোন আরবীয়। তাকে এরা মোকাদন (মুকাদ্দম) বলে ডাকেন। তিনি আবেসিনীয় ও আরবীয় নাবিকদের চালান। যেন তারা সবাই তার ক্রীতদাস বা খাস সম্পত্তি। এই মুকাদ্দম-ই জাহাজের মালিকের সঙ্গে নাবিক সরবরাহ নিয়ে দর কষাকষি ও চুক্তি ক'রে থাকেন। তিনিই নাবিকদের মাইনে-পত্র পেয়ে থাকেন, প্রত্যেককে তা দেন। তবে জাহাজের পরিচালনা ও প্রশাসন নিয়ে তাকে কোন রকম মাথা ঘামাতে হয় না।

এই নাবিকেরা এত অনুগত যে ঘটনাক্রমে যদি একটি টুপি বা অন্য কোন কিছু উড়ে গিয়ে সাগরে পড়ে আর তা তুলে আনার জন্য এদের আদেশ দেয়া হয় তবে কাপড় চোপড় খুলে সেজন্য সাগরে ঝাঁপ দিতেও বোধ হয় তারা দ্বিধা করবে না। মাছের মতই সাঁতারু এরা।

ডাঙায় ফেরার পর এদের একমাত্র কাজ হলো মদ গেলা ও স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে পানশালায় বসে থাকা। পথ চলার সময় এরা হাত ধরাধরি ক'রে এদিকে ওদিকে টলতে টলতে হাঁটে। গান করতে করতে ও চারিদিক হাঁ ক'রে দেখতে দেখতে চলতে থাকে।

এদের স্ত্রীলোকেরা আরবীয় ও মুসলমানদের মতো শালোয়ার পরে।

একুশ : মালাবারী

গোয়া ও কুমারিকার মধ্যবর্তী সাগর উপকূল অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের মালাবারী বলা হয়। এদের স্বতন্ত্র একটি ভাষা রয়েছে (মালয়ালাম)। এ অঞ্চল বহু রাজ্যে বিভক্ত। এরা পর্তুগীজদের চরম ও ভয়ঙ্কর শত্রু। সাগর পথে এরা ভয়ানক দৌরাত্ম্য চালায়, নৃশংসভাবে যুদ্ধ করে। এরা যেমন বলিষ্ঠ তেমনি খুব সাহসী। আদুল গায়ে থাকে, শুধু যা গোপন অঙ্গটুকুই কাপড় জড়ানো। মেয়েদের পরনে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড়। বাকি শরীর উদোম।

এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ পুষ্ট। মেজাজ অত্যন্ত উদ্ধত ও অহঙ্কারী। গায়ের রঙ পুরো কালো, তবে চুল ও গায়ের চামড়ায় বেশ চেকনাই রয়েছে। এ চেকনাই আনার জন্য তারা গায়ে ও চুলে তেল মাখে। কখনও এরা চুল কাটে না, একটি গিট দিয়ে তাকে মাথার উপর চূড়ার মতো ক'রে বাঁধে। মেয়ে-পুরুষ প্রত্যেকে। এদের কানের লতি আলগা, আর এতো লম্বা যে ঘাড় অবধি ঝুলে পড়ে! যার চেহারা যতো বেশি লম্বা চওড়া তার ততো বেশি সম্মান। তাকে ততো বেশি সুপুরুষ বলে মনে করা হয়। মুখের আকৃতি, শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়নের দিক থেকে তারা য়ুরোপীয়দের মতোই একেবারে। পার্থক্য শুধু যা ওই রঙের। পুরুষদের দেহ সাধারণতঃ খুব রোমশ। সারা প্রাচ্য জগতের মধ্যে এরা সব থেকে বেশি দুশ্চরিত্র ও অসৎ প্রকৃতির। সাত-আট বছর বয়সীদের মধ্যেও এমন মেয়ে খুব কম পাওয়া যাবে যারা অক্ষত-যোনি। অতি সামান্য অর্থের জন্যও এরা একজনকে ছেড়ে অন্যের ঘর করতে রাজী।

বাড়িঘর তৈরীর ক্ষেত্রে এদের কোন বৈশিষ্ট্য বা নৈপুণ্য চোখে পড়ে না। বাড়িঘর ও ঘরকন্নার উপকরণ দুই-ই কানাড়ীজন ও কোরাঙ্গীজন থেকে ভিন্ন নয়। দেবদেবী, পর্ব-পার্বণ, ধর্মীয় রীতিনীতি অপরাপর পৌত্তলিকদের মতোই। এদের মধ্যে দুই স্তরের লোক রয়েছে। এক : নায়ার—এরা অভিজাত, ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা। দুই : সাধারণ মানুষ—এদের বলা হয় পোলিয়া, এদের অস্ত্রধারণের অধিকার নেই।

নায়াররা সব সময় সাথে সাথে অস্ত্র নিয়ে ফেরে, রাজার ডাকে যে কোন মুহূর্তে অস্ত্রধারণের জন্য তৈরী। অধিকাংশই ডান হাতে একটি খোলা তরবারী, বাঁ হাতে একটি বিরাট ঢাল নিয়ে চলাফেরা করে। এই ঢালটি বেশ

বড় ও হালকা কাঠ দিয়ে তৈরী। যখন খুশী এ দিয়ে তারা তাদের দেহ ঢেকে ফেলতে পারে। এর ব্যবহারে তারা অতি অভ্যস্ত। পথে চলার সময় তরবারীর বাঁট দিয়ে ঢালের উপর এত জোরে শব্দ তোলে যে অনেক দূর থেকেও তাদের আগমন সংবাদ পাওয়া যায়। কতক আবার ধনুক ও বিষাক্ত তীর নিয়ে চলাফেরা করে। এতেও তারা বেশ পটু। কারো হাতে আবার লম্বা সুঁচালো বর্শা। কতক আবার বন্দুক নিয়ে ফেরে। সর্বদা তাতে আগুন ধরাবার জন্য ম্যাচ নিয়ে তৈরী। এর টিপকল এতো চমৎকার যে য়ুরোপের সেরা টিপকলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ওই বন্দুকের ব্যবহারে এরা এত দক্ষ যে পর্তুগীজরাও তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

এরা কেউ বিবাহিত নয়, সারাজীবন বিবাহ করতেও পারে না (এটা ঠিক নয়)। কিন্তু যে কোন নায়ার-কন্যাকে উপভোগ করার অধিকার রয়েছে তাদের। যদি অন্য সম্প্রদায়ের কোন মেয়ে তাদের পছন্দ করে তবে তাকে উপভোগের অধিকারও আছে তাদের। তা সে যে-ই হোক না কেন কিংবা বিবাহিত হোক না কেন। কোন নায়ারের কোন রমণীকে উপভোগের ইচ্ছা হলে তার বাড়ির দরজার বাইরে অস্ত্র রেখে ভিতরে ঢুকে যায়, তাকে ভোগ করে (এ বিবরণও ঠিক নয়)।

নায়াররা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখন পো পো অর্থাৎ সরে যাও, সরে যাও, হাঁক দিতে দিতে এগোয়। পোলিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা যাতে তাদের ছুঁয়ে না ফেলে, সে জন্যই এ সতর্কতা। যদি কেউ এর পরও তাদের ছুঁয়ে ফেলে তবে তাকে এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে দেবার স্বাধীনতা তার রয়েছে। কেউ তাকে দোষারোপ করবে না কেন সে এ কাজ করলো।

যদি কোন পোলিয়া তাদের ছুঁয়ে ফেলে তবে অন্ন স্পর্শ করার আগে বা অন্য কোন নায়ারের সঙ্গে কথা বলার পূর্বে তাকে নানা অনুষ্ঠান ও রীতিপ্রথা সহ স্নান ক'রে নিতে হয়। কোন খ্রীষ্টান বা অন্য ধর্মের লোকও তাদের ছুঁতে পারে না। প্রথম যখন পর্তুগীজরা ভারত আসে, কোচিনের রাজার সঙ্গে সখ্যতা ও চুক্তি করে, তখন এই নায়াররা দাবী তুললো পোলিয়া ও অন্যান্যদের মতো পর্তুগীজদেরও তাদের পথ ছেড়ে দিতে হবে। এ দাবীকে অপমানসূচক মনে ক'রে পর্তুগীজরা এতে রাজী হলো না। তারা নায়ারদের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করতো। এজন্য উলটে দাবী তুললো: তাদের যাবার বেলা নায়ারদেরই পথ দিতে হবে তাদের। শেষে বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার জন্য স্থির করা হলো: দু পক্ষের

প্রত্যেকে নিজ নিজ দল থেকে একজন ক'রে লোক বাছবে। এদের দুজনের মধ্যে সরাসরি লড়াই হবে। যে পক্ষের লোক হারবে তারাই অন্য পক্ষকে যাবার বেলা পথ ছেড়ে দেবে। এ লড়াইয়ে পর্তুগীজ লোকটি নায়ারকে হারিয়ে দিয়ে হত্যা ক'রে ফেললো। ফলে মীমাংসা হলো যে নায়াররাই পর্তুগীজদের পথ ছেড়ে দেবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে চলে যায় ততক্ষণ একপাশে সরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

নায়াররা খুব লম্বা লম্বা নখ রাখে। তারা যে অভিজাত এটি তারই নিদর্শন। লম্বা লম্বা নখ থাকলে হাত দিয়ে কোন কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারা অবশ্য বলে, যাতে কোন জিনিস চটপট হাতের মুঠোয় শক্তভাবে ধরা যায় সেজন্য এবং বিশেষ ক'রে তরবারী ধরার জন্যই তারা এগুলি রাখে। কতক পর্তুগীজ ও মেষ্টিশোর মধ্যেও এরকম নখ রাখার অভ্যাস রয়েছে। তারাও নায়ারদের মতো ওই একই যুক্তি দেখায়। নায়ারদের মধ্যে যারা প্রধান বা দলনায়ক তারা বাহুতে সোনা বা রূপার অনন্ত বা বলয় পরে। শাসনকর্তা, রাজদূত এবং রাজাও তাই। রাজা, শাসক, অন্যান্য নায়ক ও নেতারা যখন বাইরে যায় তখন নায়াররা তাদের রক্ষী হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

নায়াররা মৃত্যুদণ্ড পাবার যোগ্য কোন অপরাধ করলেও রাজা খোলাখুলিভাবে তার বিচার ও শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখেন না। অন্যান্য নায়াররাই তার বিচার করে, শাস্তি দেয়। নায়ার-মেয়েরা অন্য কোন বর্ণে বিবাহ করতে পারে না। অবশ্য বহু পর্তুগীজ ও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তাদের গোপন অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। তবে নায়াররা যদি একথা জানতে পারে কি হাতে-নাতে ধরে ফেলতে পারে তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের হত্যা ক'রে ফেলবে।

যেখানেই নায়াররা বাস করে সেখানেই জলের জন্য তারা কুয়ো খোঁড়ে। এগুলি যাতায়াতের পথের ধারে করা হয়। ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন এই জলে তারা স্নান করে, মুখহাত ধোয়। পথচারীরা দেখলে বা তাদের দিকে তাকালে মেয়ে পুরুষ কেউই কোন লজ্জা বোধ করে না। এমন কি রাজা পর্যন্ত। এ জল এতো সবুজ, নোংরা আর দুর্গন্ধে ভরা যে পাশ দিয়ে হাঁটার সময় লোকে নাক চাপা দিতে বাধ্য হবে। অথচ তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে এ জলে স্নান না করলে তারা পুরো অপবিত্র হয়ে যাবে, পাপগ্রস্ত হবে। এ স্নান কোন নদী বা প্রস্রবণের জলে করলে চলবে না, কুয়োর ওই বদ্ধ জলেই করতে হবে এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্তোত্র ও অনুষ্ঠানাদির সাহায্যে মন্ত্রপুতঃ ক'রে নেওয়াও চাই। নয়তো কোন লাভ কোন পুণ্যই নেই। দেবদেবী, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এ সব দিক

থেকে তারা অন্যান্য ভারতীয় পৌত্তলিকদের মতোই। মৃত্যুর পর এদের দেহও পুড়িয়ে ফেলা হয়। পুত্রেরা এদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না, কেননা তাদের সুনির্দিষ্ট স্ত্রী নেই, সুতরাং কে তাদের প্রকৃত সন্তান এ নিয়ে গভীর সন্দেহ থেকে যায় বলেই এ প্রথা (একথা পুরোপুরি ঠিক নয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নিদর্শন রূপেই এ প্রথা প্রচলিত।)

ব্রাহ্মণরা (নাম্বুদ্রীপাদ) রাজার মহিষীদেরও খুশী মতো উপভোগ করতে পারে। এ ইচ্ছা নিয়ে কোন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলে, তাকে প্রচুর সম্মান দেখান হয়। বোনের ছেলেরাই তাদের উত্তরাধিকারী। তারা বলে, কে তাদের পিতা এ নিয়ে সন্দেহ থাকলেও তার বোনই যে এদের মাতা এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। (বোনের ছেলেরা উত্তরাধিকার লাভ করে এ বিবরণ সত্য হলেও এজন্য যে কারণের কথা এখানে বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। অতি প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ধারাবাহিকতা থেকেই এ প্রথাটি দক্ষিণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।)

মালাবারের অন্য বর্ণের লোকদের যে পোলিয়া বলা হয় একথা আগেই বলেছি। এরা কৃষক, শ্রমিক, জেলে ও অন্যান্য জীবিকার লোক। এদের অতি হেয় চোখে, ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। অতি দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটায় এরা। কোন রকম অস্ত্র ধারণের অধিকারও এদের নেই। নায়াররা পথ দিয়ে চলার সময় এরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না, স্পর্শ করতেও পারে না। তাদের চিৎকার শুনলেই এরা একপাশে সরে যায়, আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানায়, সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত মুখ তুলে তাকাতেও সাহস পায় না। অন্যান্য ক্ষেত্রে এরা অপরাপর ভারতীয়দের মতোই রীতি-নীতি আচার-প্রথা মেনে চলে।

বাইশ ঃ মুর ও ইহুদী

ভারতের সব অঞ্চলেই প্রচুর সংখ্যায় মুর এবং ইহুদী বসবাস করে। যেমন গোয়া ও কোচিনে, তেমন দেশের ভিতর অঞ্চলে। এদের কেউবা বাইরে থেকে এসেছে, বাকিরা পুরুষানুক্রমে বাস করার সূত্রে জন্ম-অধিকারেই ভারতীয়। কতক এদের অতীতে ধর্মান্তরের ফলে, কতক ইহুদী ও মুরদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাদের ধর্মমত গ্রহণ করেছে। বাড়িঘর ও পোষাক আশাকের দিক থেকে তারা যে দেশে বাস করেছে সেখানকার রীতিনীতিই অনুসরণ করে। ভারতীয় অঞ্চলে তাদের নিজস্ব গীর্জা, অর্থাৎ সিনাগগ ও মসজিদ রয়েছে। আপন আপন ধর্মীয় রীতি অনুসারে সেখানে তারা উৎসব অনুষ্ঠানাদি পালন করে।

কিন্তু পর্তুগীজ অঞ্চলে তাদের, এমন কি ভারতীয়দেরও, খোলাখুলিভাবে কোন ধর্মানুষ্ঠান পালন করতে দেয়া হয় না। গোপনে নিজ নিজ বাড়িতে পালন করে বা। শহরের বাইরে এবং যেসব অঞ্চলে পর্তুগীজ শাসন নেই সেখানে অবশ্য কোন বাধা নেই। কিন্তু পর্তুগীজ শহরে এসব খোলাখুলি ভাবে করতে দেখা গেলে বা খ্রীষ্টানদের সঙ্গে (ঘনিষ্ঠ ভাবে) মেলামেশা করতে দেখা গেলে, মেয়ে বা পুরুষ যাই হোক না কেন প্রাণদণ্ড পেতে হয়। অবশ্য খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে আলাদা কথা।

কোচিন শহরের বাইরে, রাজার রাজধানীতে প্রায়ই এমন কাণ্ড (হিন্দুর সাথে অন্যধর্মীর বিবাহ) ঘটে। সেখানে ইহুদী ও মুররা স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারে। সেখানে ইহুদীদের অনেক অতি সুদৃশ্য বাড়িঘর রয়েছে। তারা বেশ ধনী সওদাগর। কেউ কেউ কোচিনের রাজার অতি ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা। সেখানে তাদের সিনাগগও রয়েছে। হিব্রু বাইবেল এবং মোজেসের অনুশাসনও বর্তমান। এদের অধিকাংশেরই গায়ের রঙ য়ুরোপীয়দের মতো অতি ফরসা। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই সুন্দরী।

মুরদেরও মসজিদ রয়েছে এখানে। তার উপরতলায় অনেক ঘর আর দরদালান। মসজিদে যাবার উপযুক্ত হবার আগে তাদের ছেলেদের এখানে ধর্মশিক্ষা দেয়া হয়। মসজিদে প্রবেশের মুখে তারা প্রত্যেকে হাত পা ধুয়ে নেয়। এজন্য তাদের মসজিদের বাইরে সব সময় একটি জলে ভরা কুণ্ড বা পুকুর থাকে। মসজিদের ভিতর ঢোকার সময়ে তারা ফটকের বাইরে তাদের জল পারকো বা

চটি রেখে দেয়। ইহুদীদের মতো তারাও স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তারা শূকরের মাংস খায় না। মৃত্যুর পর তাদের দেহ সমাধিস্থ করা হয়। তাদের গীর্জায়, (মসজিদে) কোন মূর্তি থাকে না। শুধু কতক পাথর বা গোলাকার স্তম্ভ থাকে। তার উপর চালডীয়ান ভাষায় (কোরানের) কতক বাক্য খোদাই করা।

একদিন ঘটনাক্রমে এক পর্তুগীজ বন্ধুর সঙ্গে আমি এক মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় আমার মুসলমান গীর্জা ও তাদের প্রার্থনা দেখার কৌতূহল হলো। আমরা ঢুকতে গেলাম। দ্বাররক্ষক আমাদের জুতো খুলতে বললে। রাজী হলাম না আমরা। সে আমাদের বললে, এভাবে মসজিদে ঢোকা রীতি নয়। ঢুকতেও দিলে না। তবে অনুষ্ঠান দেখার জন্য দরজার কাছে দাঁড়াতে দিলে। ভিতরে কী আছে তা যাতে দেখতে পাই সেজন্য কতক জানালাও খুলে দিলে। পর্তুগীজ বন্ধু মসজিদের মধ্যে কোন কিছু নেই দেখে জানতে চাইলে যে তারা কোন্ সন্ত ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। মুরটি উত্তরে জানালে যে তারা কোন জড় বস্তু বা পাথরের কাছে প্রার্থনা জানায় না। যিনি স্বর্গে থাকেন সেই সজীব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়। সে আরো বললে: অহঙ্কারী পর্তুগীজ খ্রীষ্টান এবং পৌত্তলিকেরা আসলে একই ধর্মের লোক। উভয়েই কাঠ ও পাথরে গড়া মূর্তির কাছে প্রার্থনা জানায়। ওই সব মূর্তির উপর এমন সব মহিমা আরোপ করে যা একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বরের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এ কথা শুনে পর্তুগীজ বন্ধুটি তো রেগে আগুন। চড়া গলায় নানা কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলে তাকে। তাদের ঘিরে অনেক মুর ও ভারতীয় জড়ো হয়ে গেল। দেখা দিল বিরাট বচসা। আমি বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে চলে এলাম। তা না হলে কী কাণ্ড শেষ পর্যন্ত ঘটত না জানি!

এই মুরেরা মশলাপাতি নিয়ে নিয়মিত লোহিত সাগর অঞ্চলে ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করে। জল ও স্থল উভয় পথেই। তাদের অনেকেই পর্তুগীজদের মধ্যে বসবাস করে। তাদের সঙ্গে একত্রে ব্যবসা বাণিজ্য করতে যায়। তবু গোপনে গোপনে তারা পর্তুগীজদের পরম শত্রু। তাদের অনেক ক্ষতি করে বিভিন্ন ভাবে। এদের জন্যই এখানে বিশেষ কাউকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা সম্ভব হচ্ছে না। সব রকম পন্থাতেই তারা এদিকে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাদের মত অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। ফলে ভারতীয়রা তাদের (পৌত্তলিক) ধর্ম ও আচার প্রথাই পালন ক'রে চলেছে।

তেইশ : দেবমন্দির ও বিগ্রহ

প্রাচ্য দেশগুলি জুড়ে বিভিন্ন প্রকারের অগুণতি দেবমন্দির ও বিগ্রহ দেখা যায়। এদের মধ্যে কতক বিগ্রহকে তারা বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। বিভিন্ন স্থান থেকে ভারতীয় ও পৌত্তলিকেরা পাপ স্খলনের জন্য সেখানে তীর্থ করতে আসে। এসব বিগ্রহ ও মন্দির প্রচুর ব্যয় ক'রে তৈরী করা, প্রচুর কারুকার্যমণ্ডিত। প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে এদের গুটি কয়েকের বর্ণনা দেব এখানে। এথেকেই ধারণা করে নেয়া সম্ভব হবে অন্যগুলি কি রকম।

গোয়ার উত্তর দিকে, ব্যাসাইন শহরের কাছে একটি দ্বীপ রয়েছে। পর্তুগীজদের অধীন এ দ্বীপটির নাম সলসেত্তি। যে সব মন্দির বা গুহায় ভারতীয়রা বিগ্রহকে রাখে তার মধ্যে যে কটি সব থেকে বিখ্যাত তার দুটিই রয়েছে এখানে। এর ভেতর একটি গুহা এক কঠিন পাথরের পাহাড়ের গোড়ার ভাগ খুঁড়ে তৈরী করা হয়েছে। আয়তন ৪০০ বাড়িঘর থাকা একটি গ্রামের মত্তোই বিরাট। এখানে একটি দেবমন্দির রয়েছে। বিগ্রহটি এই পাহাড়েরই গা কেটে বানানো হয়েছে। দেখতে অতি ভয়ংকর ও বিদঘুটে। ইদানীং সেখানে গ্রে ফ্রায়াররা সন্ত মাইকেলের নামে একটি মঠ বানিয়েছে। পর্বতের এই গুহার মধ্যে ঢুকলে নিচের চত্বরটিতে অনেক বিগ্রহ দেখা যাবে। তারপর সোপান বেয়ে উঠে গেলে আবার আরেকটি চত্বর। সেখানেও অনেক কক্ষ ও বিগ্রহ। সবগুলিই কঠিন পাথর খোদাই ক'রে তৈরী। কক্ষ শ্রেণীর কাছেই একটি বিরাট জলাধার রয়েছে। সেটি জলে ভরা। তার মাথার দিকে কয়েকটি ছিদ্র আছে, তার ভেতর দিয়ে বর্ষার জল এখানে এসে জমা হয়। এটির উপরে আরো একটি চত্বর রয়েছে। সেখানেও অনেক কক্ষ, অনেক বিগ্রহ বর্তমান। সংক্ষেপে বলতে গেলে চারটি চত্বরে মোট তিনশোটি কক্ষ। প্রত্যেকটি কক্ষই বিদঘুটে ও ভয়ানক দর্শন শয়তান আকৃতির সব বিগ্রহের খোদাই মূর্তিতে ভরা। দেখলে ঘৃণা আর বিরক্তি দেখা দেয়।

অন্য মন্দির বা দেব-গুহাটি দ্বীপের আরেক জায়গায়। সেটিও কঠিন পাথর কুরে তৈরী। আয়তন বেশ বড়ো, অনেক জায়গা জুড়ে উঠেছে। এটিও দেব-বিগ্রহে ভরা। পাথর খোদাই ক'রে সেগুলি বানানো হয়েছে। অতি কুৎসিত

তাদের রূপ ও চেহারা। ঠিক যেন শয়তানের অনুগ্রহ-ধন্য সব। দেখলেও গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে।

আরো একটির কথা বলি। এটিও তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান মন্দিরগুলির একটি। পুরীতে এর অবস্থান (ঘারাপুরী, বোম্বাইয়ের কাছে থাকা এলিফ্যান্টা গুহার স্থানীয় নাম)। পর্তুগীজরা একে প্যাগোডা অব দি এলিফ্যান্ট বলে। এই দ্বীপে একটি উঁচু পাহাড় আছে। তার চূড়ায় একটি গুহা বর্তমান। সেটি পাহাড়ের নিচের দিকে চলে গেছে। সেখানে পাথর কেটে ও খোদাই ক'রে বিরাট মঠের মতো বানানো হয়েছে। এর দেয়ালের চারদিকে হাতি, সিংহ, বাঘ এই ধরনের হাজার প্রকার বন্য ও হিংস্র প্রাণীর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। কতক স্ত্রী-যোদ্ধার মূর্তি এবং আরো বিভিন্ন রকমের সব আংশিক বিনষ্ট চিত্র খোদাই রয়েছে। এত চমৎকার, এত কুশলী হাতের কাজ যে অভিভূত হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। চীনারা যখন ভারতের দেশগুলিতে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করতো তখন তারা এসে এগুলি বানিয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। তারা অতি সুদক্ষ শিল্পী। এ স্থানটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং নষ্ট হয়ে চলেছে। পর্তুগীজরা এ অঞ্চল অধিকার করার পর থেকেই এ অবস্থা।

এ স্থানগুলি দেখার পর সহজেই ধারণা ক'রে নেয়া যেতে পারে, যে সব অঞ্চলে তাদের নিজস্ব রাজ্য ও রাজা রয়েছে সে সব স্থানে বর্তমান কালেও কী ধরনের সব মন্দির ও বিগ্রহ আছে।

চব্বিশ : জীবজন্তু

সারা ভারত জুড়ে বিপুল গো-সম্পদ রয়েছে। ষাঁড়, গরু, ভেড়া, শূকর, ছাগল, পাঁঠা ইত্যাদি। একেবারে জলের দামেই সেখানে এদের পাওয়া যায়। তবে এদের মাংস য়ুরোপীয় প্রাণীদের মাংসের মতো খেতে তেমন সুস্বাদু নয়। এখানকার উষ্ণ আবহাওয়ার জন্যই এই পার্থক্য। আর, সেজন্যই তাদের তেমন কদর বা চাহিদা নেই। মাত্র পাঁচ বা ছয় পরদাওয়ে খরচ করলে সেরা জাতের একটি গরু কেনা যায় গোয়াতে। ষাঁড় জবাই করা হয় না বললেই চলে। জমি চাষের জন্য রেখে দেয়া হয়। শূকর, ভেড়া, ছাগল এ সবের দামও ওই অনুপাতে। ভেড়ার মাংসের চাহিদা খুবই কম। কেউ বড়ো একটা খায় না। রোগীদের পক্ষে তা খাওয়াই নিষেধ। শূকরের মাংস তুলনায় অনেক স্বাস্থ্যকর। রোগীদের ভেড়ার বদলে শূকরের মাংস খাবার অনুমতি তবু দেয়া হয়। কতক ভেড়া আছে পরিমাণের দিক থেকে যাদের পাঁচ ঠ্যাং-ওয়ালা বলা চলে। কেননা, এদের লেজ এতো বড়ো আর তাতে এতো মাংস রয়েছে যা যে কোন একখানা ঠ্যাংয়েরই সমান।

মোষও আছে অনেক। তবে, খাবার জন্যে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। গরিব লোকেরাই যা খায়। এদের দুধ কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট। প্রচুর বিক্রী হয়। ক্রীতদাস ও কানাড়ীজনেরা বিপুল সংখ্যায় পথে ঘুরে ঘুরে মোষের দুধ, ছাগলের দুধ, চমৎকার ননী, টাটকা মাখনের ছোট ছোট দলা বিক্রী করে। এ রকম ছোট ছোট দলায় সাদা পনিরও বিক্রী হয়। তবে সেগুলো যেমন নোনতা তেমনি শুকনো।

বন্য বরাহ, কতক জাতের খরগোশ ও শশক, লালহরিণ—এ সবও দেখা যায়। তবে বেশি সংখ্যায় নয়। মোরগ, খাসি মোরগ, প্যাট্রিজ (patridges), ঘুঘু ইত্যাদি অগণিত সংখ্যায় পাওয়া যায়, জলের মতোই দামে সস্তা। গোয়া দ্বীপ ও তার আশেপাশে চড়াই ও আরো কতক ছোট ছোট পাখি দেখা যায়। তবে তেমন বেশি নয়। কিন্তু কোচিন ও মালাবার উপকূলে এসব একেবারেই দেখা যায় না।

ভারতে অনেক বাদুড়ও রয়েছে। এদের কতক এতো বড়ো আকারের যে বললে বিশ্বাস হবে না। এরা গাছপালা, ফল-ফলাদি ও উদ্ভিদের দারুণ ক্ষতি

করে। এজন্য কানাড়ীরা রাতে গাছ পাহারা দেয়ার জন্য লোক রাখতে বাধ্য হয়। তবু তাদের উপদ্রবের হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। ভারতীয়রা এদের মাংস খায়। বলে, এগুলি খেতে নাকি প্যাট্রিজের মাংসের মতোই ভালো।

অবিশ্বাস্য সংখ্যায় কালো কাক রয়েছে। ক্ষতিও করে যথেষ্ট। কোন ভয়ডর নেই। একেবারে জানালার কাছে উড়ে চলে আসে। টেবিলের উপরকার খাবার থালা থেকে খাবার পর্যন্ত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়। একবার আমি বাড়ির একখানা ঘরে বসে লিখে চলেছি। জানলাটা খোলা। একটা কাক সেখান দিয়ে ঢুকে শিঙের তৈরী দোয়াতদানীটা থেকে তুলোটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে টেবিলের উপর থাকা সব কাগজ পত্রে কালি ছড়িয়ে দিলে। তাকে তাড়াবার জন্য যতো রকম যা করা সম্ভব তার কিছুই বাদ দিলাম না আমি। এগুলি সাধারণত মোষের পিঠে গিয়ে বসে থাকে ও তাদের লোম ঠোকরায়।

ইঁদুরের সংখ্যাও এখানে বিরাট। এক একটা এতো বড়ো, মনে হবে, বুঝিবা বাচ্চা শুয়োর। ওই বিরাট চেহারা দেখে বিড়ালরা পর্যন্ত ওদের ছুঁতে সাহস করে না। অনেক সময় ওরা বাড়ির নিচে সুড়ঙ্গ খোঁড়ে। এভাবে ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতের ক্ষতি ক'রে চলে। ফলে, বহু সময়ে বাড়ি ভুষড়ে পড়ে, নষ্ট হয়ে যায়। এক ধরনের ইঁদুর আছে যেগুলি ক্ষুদে, গায়ের লোম লালচে। এদের গন্ধ-মূষিক বলা হয়। শরীরে এদের এমন গন্ধ, মনে হবে যেন মৃগনাভিতে ভরপুর।

পিঁপড়ের আধিক্য ভারতের সব অঞ্চলেই এতো বেশি, আর তার ক্রিয়াকলাপ এতো বিরক্তিকর, যারা তা চোখে দেখেনি বিশ্বাস করতে চাইবে না। এমন কোন কিছু নেই যা এরা খায় না। যাতে চর্বি আছে এমন জিনিষ তো বটেই, এমন কি কাপড় চোপড় পর্যন্ত। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তুমি দেখবে তোমার রাখা পোষাকের উপর হাজার খানেক পিঁপড়ে পিল পিল করছে। দেখতে না দেখতে তারা একখানি পাউরুটি খেয়ে লোপাট ক'রে দেবে। এ জন্য ভারতের সর্বত্র আলমারীতে খাদ্যপদার্থ রাখা হয়। কাপড় চোপড়, পোষাক পরিচ্ছদ রাখা হয় বাক্সে পুরে। এ সব আলমারী ও বাক্সে চারটে ক'রে পায়া থাকে, পায়াগুলি পাথর বা কাঠের জলভরা পাত্রের উপর বসিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও এগুলিকে দেয়াল ঘেঁষে না রেখে, খানিক দূরে সরিয়ে রাখা হয়। ফলে পিঁপড়েরা আর ওতে হানা দিতে পারে না। এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য

অনেকে খাটগুলিকেও ওইভাবে জলের পাত্রের উপর বসায়। টেবিলের বেলাও তাই। যে সব লোক ক্যানেরি পাখি বা ওই জাতীয় ছোট ছোট পাখি পোষেন তারা এগুলিকে পিঁপড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দাঁড়ের উপর রাখেন। এ পাখি তারা সখ করে পর্তুগাল, তুরস্ক বা পারস্য থেকে আনেন। যে দাঁড়টিতে পাখিটিকে রাখা হয় সেটিও আবার একটি জলের পাত্রের উপর বসানো থাকে। নয়তো পিঁপড়েরা তাকে নিকেশ ক'রে দেবে। যদি এই দাঁড় ঝুলানোও থাকে আর একখণ্ড সুতা তার লাগোয়া থাকে তবে তাই বেয়েই সেখানে তারা হাজির হবে।

যাদের আলমারী কেনার ক্ষমতা নেই এমন সৈনিক ও গরিব লোকেরা বাড়তি খাবারদাবার, রুটি এসব কাপড়ে পুঁটলি বেঁধে দেয়ালে পোতা পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। তার চারদিকে কাঠ কয়লা দিয়ে একটা বৃত্ত এঁকে দেয়। ফলে পিঁপড়েরা আর ওই কালো গণ্ডী পার হয়ে তার কাছে ঘেঁষতে পারে না।

এক ধরনের পিঁপড়ে আছে যা আঙুলখানেক লম্বা। গায়ের রঙ লালচে। এরা ক্ষেত-খামারে হামলা চালায়। শাকপাতা, ফল-তরকারী, গাছ-গাছড়ার দারুণ ক্ষতি করে।

মানুষের পোষাক-আশাক কাটে ও নষ্ট করে এমন কীট-পতঙ্গও অগুণতি সেখানে। এজন্য সেখানে কখনো প্রয়োজনের বেশি পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করা উচিত নয় ও প্রতিদিন তা পরা উচিত। নয়তো কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলি পোকায় কেটে বা নষ্ট ক'রে ফেলবে। বই-কাগজপত্রও পোকার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা দুষ্কর। এগুলি দেখতে কানকোটারী পোকার মতো (উই পোকা)। হামেশা এগুলি নানা কাগজপত্র, দরকারী সাক্ষ্যপ্রমাণ, দলিলাদি নষ্ট ক'রে ফেলে।

অনেক ছারপোকাও রয়েছে। একপ্রকার পতঙ্গ আছে যেগুলি ওড়ে, দেখতে মৌমাছির দ্বিগুণ আকারের। নাম তার বরট (তেলেপোকা বা আরশোলা)। এরাও প্রচুর ক্ষতি করে। চিনি, মধু, ঘি, তেল ও চর্বিযুক্ত সব রকম খাদ্যপদার্থ ও মিঠাই কিছুই এদের হাত থেকে রেহাই পায় না। কাপড়-চোপড়ের বাক্সেও এরা হানা দেয়। এরা যেখানেই থাকে সেখানেই লাদ দিয়ে সব জিনিষে দাগ ধরাবে। এগুলি এদেশের উপর পিঁপড়ের মতোই ঈশ্বরের এক অভিশাপ।

মূল ভূ-ভাগে বাঘও রয়েছে। সিংহ ও ভাল্লুকের মতো হিংস্র প্রাণী না থাকার মতোই বা নেই। তবে সাপ, গিরগিটি (Lizartes) এ ধরনের বিষাক্ত প্রাণী

অজস্র। টিকটিকিগুলি ঘরের দেয়ালময় বুকে হেঁটে বেড়ায়। প্রায়ই শুয়ে বা ঘুমিয়ে থাকা মানুষের গায়ে খসে পড়ে। এজন্য সম্পন্ন লোকেরা বিছানায় মশারী বা চাঁদোয়া টাঙায়। বহুরূপী গিরগিটিও দেখা যায়। এরা নাকি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকে বলে শোনা যায়। যাই হোক, এরা মোটেই ক্ষতিকর নয়।

বানর এখানে প্রচুর। নারকেল গাছের যথেষ্ট ক্ষতি করে এরা। নারকেল গাছে আরো একরকমের ছোট প্রাণী দেখা যায়। এদের **Bichos de Palmeyras** বা নারকেল গাছের পশু বলে (কাঠবিড়ালী)। এগুলি অনেকটা নেউলের মতো দেখতে। লোটা দোয়াতদানির কলমের পুচ্ছের মতো, লোমগুলো স্থানে স্থানে ধূসররঙা। এগুলি বেশ মনকাড়া প্রাণী। পোষার পক্ষে, নিয়ে সময় কাটাবার পক্ষে চমৎকার। তোতা পাখিও অসংখ্য, বনের মধ্যে অবাধে ঘুরে বেড়ায়।

নির্দেশিকা